কন্দাল ফসলঃযে সকল ফসলের কাণ্ড বা শিকড় কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জমা হওয়ার দরুন স্ফীত হয়ে

রূপান্তরিত হয় সেগুলোকে কন্দাল ফসল বলে। বাংলাদেশে আলু, মিষ্টি আলু, কচু, গাছ আলু বা মেটে আলু, কাসাবা, শটি, ওলকচু ইত্যাদি কন্দাল ফসল হিসেবে আবাদ হয়।

অধিক শর্করা থাকার কারণে অনেক দেশেই এসব ফসল প্রধান খাদ্য এবং প্রধান সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কন্দাল ফসল অন্যান্য প্রধান খাদ্য শস্য থেকে বেশি

শক্তি ও আমিষ তৈরি করে।বাংলাদেশে প্রায় ৫.৬৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে কন্দাল ফসলের (আলু, মিষ্টি আলু ও কচু) চাষ করা হয় যার বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ১২৩.৬ লক্ষ টন। তাই কন্দাল ফসল দেশের উৎপাদিত খাদ্য ঘাটতি এবং পুষ্টির অভাব পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কন্দাল ফসলসমূহ

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ ও খনিজসহ অনেক পুষ্টিকর উপাদান সমৃদ্ধ থাকে।আলুর জাতঃ

বারি আলু-১৩ (গ্রানোলা)ঃনেদারল্যান্ড থেকে গ্রানোলা জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদেরউপযোগিতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-১৩ (গ্রানোলা)’ জাত হিসেবে ১৯৯৪ সালেঅনুমোদন লাভ করে। গাছ কিছুটা ছড়ানো প্রকৃতির। কাণ্ডের সংখ্যা বেশি ও সবুজ। প্রথমে গাছের বর্ধন ধীর গতিতেহয়, তবে পরবর্তী পর্যায়ে সমস্ত জমি গাছে ঢেকে যায়। খরা সহ্য করার ক্ষমতা আছে। আলু গোল–ডিম্বাকার, মাঝারিআকৃতির, ত্বক অমসৃণ হালকা তামাটে হলুদ, শাঁসের রং ফ্যাকাসে হলুদ ও চোখ অগভীর। অঙ্কুর প্রথমে গোলাকার,পরে খাটো কাণ্ডের মতো, রং তামাটে–বেগুনি ও কিঞ্চিৎ রোমশ হয়।সুপ্তিকাল বেশি এবং সাধারণ তাপমাত্রায় বীজের সুপ্ততা ৭০–৭৫ দিন। জীবনকাল ৯০–৯৫ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষকরলে হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫–৩০ টন হয়। মড়ক সহনশীল ও অন্যান্য ভাইরাসজনিত রোগ প্রতিরোধী। জাতটি বিদেশেরপ্তানিযোগ্য এবং আগাম জাত হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। জাতটি সারা দেশেই চাষ করা যায়।আলুর সুপ্তিকাল বেশি হওয়ায় আলু ৪–৫ মাস ঘরে অনায়াসে সংরক্ষণ করা যায়।

বারি আলু-২৫ (এসটেরিক্স)

নেদারল্যান্ড থেকে সংগৃহীত এসটেরিক্স জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশেরআবহাওয়ায় চাষাবাদের উপযোগিতা যাচাই–বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-২৫ (এসটেরিক্স)’জাত হিসেবে ২০০৫ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ খাড়া এবং গড়ে প্রতি গাছে ৩–৪টি কাণ্ড থাকে। পাতা বড়, সবুজ ও ছড়ানো, গাছের গঠন ও পাতার বিন্যাসচমৎকার। আলু ডিম্বাকার থেকে লম্বাকৃতির, মাঝারি থেকে বড় আকৃতির, মসৃণ লাল ত্বক, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, চোখঅগভীর। অঙ্কুর বেগুনি বর্ণের ও লোমশ। জীবনকাল ৯০–৯৫ দিন। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫–৩০ টন।

এই জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী, তবে ইতোমধ্যেই এটি খাবার আলু হিসেবেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

বারি আলু-২৮ (লেডি রোসেটা)

নেদারল্যান্ড থেকে সংগৃহীত লেডি রোসেটা জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশেরআবহাওয়ায় চাষাবাদের উপযোগিতা যাচাই–বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-২৮ (লেডি রোসেটা)’ জাতহিসেবে ২০০৮ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪–৫টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড শক্ত, খাড়া ও আংশিক হেলানো। পাতাগুলো মাঝারিআকারের এবং গাঢ় সবুজ রঙের। আলু গোলাকার, রঙ লাল এবং ত্বক মসৃণ। শাঁসের রং হলুদাভ সাদা এবং চোখ হালকাগভীর।

জীবনকাল ৯০–৯৫ দিন। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫–৩০ টন।এই জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

বারি আলু-২৯ (কারেজ)

নেদারল্যান্ড থেকে সংগৃহীত জাতটি সংগ্রহ করেবাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদের উপযোগিতা যাচাই–বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-২৯ (কারেজ)’  
জাত হিসেবে ২০০৮ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪–৫টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড শক্ত, খাড়া এবং আংশিক হেলানো। পাতা মাঝারি আকারেরও গাঢ় সবুজ রঙের।

আলু ৯০–৯৫ দিনে পরিপক্কতা লাভ করে। আলুর আকৃতি গোল থেকে ডিম্বাকৃতি। আলুর ত্বক লাল ও মসৃণ।শাঁসের রং হলুদাভ সাদা এবং চোখ হালকা গভীর।

এই জাতের হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫–৩০ টন।জীবনকাল ৯০–৯৫ দিন। এটি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য উপযোগী।

বারি আলু-৩৪ (লরা)জার্মানি থেকে সংগৃহীত লরা জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৩৪ (লরা)’ জাত হিসেবে ২০১১ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।গাছ কিছুটা ছড়ানো, মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড শক্ত ও নীল বেগুনী বর্ণের মিশ্রণ দেখা যায়। প্রান্তীয় পাতা একক পাতার সাথে সংযুক্ত থাকে। পত্রকোষ সবুজ নীল বর্ণের। পাতায় ও কাণ্ডে হালকা রোমশ দেখা যায়।  
আলু ডিম্বাকার ও মাঝারি আকৃতির। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং গাঢ় হলুদ। চোখ হালকা অগভীর। সাধারণ তাপমাত্রায় ৫৫-৬০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। অঙ্কুর ডিম্বাকার, অল্প এন্থোসায়ানিন আছে, অগ্রভাগ হালকা লোমশ ও এন্থোসায়ানিন যুক্ত। আলুতে শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২০.২২±১%।  
৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ২৫-৩৫ টন। জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

**বারি আলু-৩৫**  
বাংলাদেশে নিজস্ব সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাতটি এদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৩৫’ জাত হিসেবে ২০১২ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।  
গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তার কম, পাতা কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন কম।আলু ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং বাদামী, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং হালকা ক্রিম, চোখ অগভীর। সাধারণ তাপমাত্রায় ৫০-৫৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।অঙ্কুর মাঝারি উপগোলাকার, খুবই কম এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিকে পাতলা লোমশ, অগ্রভাগছোট আকারের। আলুতে শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২০.২৬ ± ১%।৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩০-৪৫ টন। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৩৬  
বাংলাদেশে নিজস্ব সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাতটি এদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৩৬’ জাত হিসেবে ২০১২ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তার বেশি। পাতা খুব কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন যুক্ত।আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং লাল। চোখ অগভীর। সাধারণ তাপমাত্রায় ৫৫-৬০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।অঙ্কুর ছোট উপগোলাকার, গোড়ার দিকে পাতলা লোমশ, অগ্রভাগে খুবই কম পরিমাণে এন্থোসায়ানিন আছে এবং লোম অনুপস্থিত। আলুতে শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৯.৬৮ ± ১%।৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩০-৪০ টন। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৪০  
বাংলাদেশে নিজস্ব সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাতটি এদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৪০’ জাত হিসেবে ২০১২ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তার কম, পাতা খুব কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন নেই।আলু খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং হলুদ, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং ক্রিম। চোখ মধ্যম অগভীর।সাধারণ তাপমাত্রায় ৪০-৪৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। অঙ্কুর মাঝারী ইস্ফেরিক্যাল,গোড়ার দিকে শক্ত পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিকে মাঝারি লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারি।আলুতে শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২০.২২ ± ১%।৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩৫-৫৫ টন। জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৪১

বাংলাদেশে নিজস্ব সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত {জাতটি এদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৪১’ জাত হিসেবে ২০১২ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মাঝারি উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি বেশি, পাতা বড়, খুব কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন মাঝারি পরিমাণে বিদ্যমান। আলু গোলাকার থেকে চ্যাপ্টা গোলাকার আকারের। আলুর রং গাঢ় লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং হালকা হলুদ। চোখ মাঝারি অগভীর।

সাধারণ তাপমাত্রায় ৪৫-৫০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। অঙ্কুর মাঝারি ওভোয়েড (ovoid), গোড়ার দিক খুব দুর্বল পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক খুব দুর্বল পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক মাঝারি লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারি। আলুতে শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২১.২০±১%। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।

গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩৮-৫৪ টন। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৪৬

আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র, লিমা, পেরু থেকে সংগৃহীত এলবি-৭ (বংশ CIP-393371.58) জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৪৬’ জাত হিসেবে ২০১৩ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

অঙ্কুর মাঝারি ওভোয়েড (ovoid), গোড়ার দিক মাঝারি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক ঘন শক্ত লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারি। সাধারণ তাপমাত্রায় ৪৫ - ৪৮ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। গাছ কিছুটা লম্বা স্বভাবের এবং গড়ে ৩/৫ টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম, পাতা দুর্বল ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় কোনো এন্থোসায়ানিন নেই।

আলু গোলাকৃতি থেকে খাটো ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি থেকে বড় আকারের। আলুর রং হালকা হলুদ, চামড়া মোটামুটি মসৃণ। আলুর শাসের রং ক্রিম। চোখ মাঝারি গভীর। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৯ ± ১%। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।

গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩০-৪০ টন। এ জাতটি নাবি ধ্বসা রোগ প্রতিরোধী এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৪৮ বাংলাদেশে নিজস্ব সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত (বংশ গঋ-ওও দ্ধ ঞচঝ-৬৭) জাতটি এদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৪৮’ জাত হিসেবে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ। ৩-৪ টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ কিন্তু গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিনের মধ্যম বিস্তৃতি আছে। মধ্যম আকারের পাতা কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন খুবই কম বিদ্যমান।

আলু খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতি মধ্যম আকারের। আলুর রং হলুদ, শাসের রং হালকা হলুদ। চোখ মধ্যম অগভীর। শুষ্ক পদার্থ ১৮.৪২ ± ১%।

অঙ্কুর ছোট আকারের ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল, গোড়ার দিক এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি মধ্যম, গোড়ার দিক বেশি লোমযুক্ত, অগ্রভাগ ছোট আকারের। সাধারণ তাপমাত্রায় ৫০-৫৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।

জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ২৬.০৫-৬২.৪১ টন।

এ জাতটি সাধারণ তাপমাত্রায় ৫-৬ মাস সংরক্ষণ করা যায় এবং খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।

বারি আলু-৫৩ :

আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র, লিমা, পেরু থেকে সংগৃহীত এলবি-৬ (বংশ 387015.3 × 386316.14) জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৫৩’ জাত হিসেবে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ কিছুটা লম্বা স্বভাবের এবং গড়ে ৩/৫ টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি গাঢ় কম, পাতা কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন বিস্তৃতি মধ্যম।

আলু গোলাকৃতি থেকে খাটো ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। আলুর রং গাঢ় লাল, চামড়া মোটামুটি মসৃণ। আলুর শাসের রং হালকা হলুদ। চোখ গভীর। শুষ্ক পদার্থ ২০.৪২ ± ১%।

অঙ্কুর মাঝারি ওভোয়েড, গোড়ার দিক মাঝারি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক ঘন শক্ত লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারি কিঞ্চিৎ লোমযুক্ত। সাধারণ তাপমাত্রায় ৪৫-৪৮ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩২-৩৪ টন।এ জাতটি নাবি ধ্বসা রোগ প্রতিরোধী এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৫৪ (মিউজিকা) নেদারল্যান্ড থেকে সংগৃহীত মিউজিকা জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৫৪’ (মিউজিকা) জাত হিসেবে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কাণ্ড সবুজ কিন্তু গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। ৩-৬ টি কাণ্ড থাকে। পাতা ছোট আকারের, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুবই কম বা থাকে না।

আলু মাঝারি আকারের, ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির। চামড়ার রং হলুদ, শাঁসের রং হালকা হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট। শুষ্ক পদার্থ ১৮.১৮ ± ১%।

অঙ্কুর ছোট আকারের ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল, গোড়ার দিক এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি মধ্যম, গোড়ার দিক মাঝারি লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারি। সাধারণ তাপমাত্রায় ৪৫-৪৮ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।

৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪১.১৯ (২৫.৫৯-৫৭.৫১) টন।

এ জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৫৬

বাংলাদেশে নিজস্ব সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত {(বংশ G90) (8.46)}জাতটি এদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৫৬’ জাত হিসেবে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ। ৪-৬ টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড লাল-বাদামী এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুব বেশি। পাতা মধ্যম আকৃতির, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম।

আলু খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রং লাল (বেগুনী), চামড়া মসৃণ, শাসের রং হলুদ। গভীর চোখ বিশিষ্ট। শুষ্ক পদার্থ ১৯.১৫ ± ১%।

অঙ্কুর মাঝারি ওভোয়েড, গোড়ার দিক খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক হালকা লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারি। সাধারণ তাপমাত্রায় ৫০-৫৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।

জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ২৯.৬৪-৪৫.০১ টন।

এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী ও স্ক্যাব রোগ প্রতিরোধী।

বারি আলু-৫৭বাংলাদেশে নিজস্ব সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত {(বংশ C90) (8.73)জাতটি এদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৫৭’ জাত হিসেবে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। পাতা মধ্যম আকৃতির, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম।

আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রং হলুদ, চামড়া মসৃণ, আলুর শাসের রং সাদা। চোখ মধ্যম গভীর। শুষ্ক পদার্থ ১৮.৯৭ ± ১%।

অঙ্কুর মাঝারি ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল, গোড়ার দিক এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি মধ্যম, গোড়ার দিক হালকা লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারি। সাধারণ তাপমাত্রায় ৫০-৫৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।

জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ২৯.৩৪-৪৫.২৪ টন।

এ জাতটি নাবিধ্বসা রোগ প্রতিরোধী, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৬২ বাংলাদেশে নিজস্ব সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাতটি এদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৬২’ জাত হিসেবে ২০১৫ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৭টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা-প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ, মাঝারি ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি মধ্যম।

পাতা মাঝারি আকারের ও কম ঢেউ খেলানো। পাতায় সবুজ রঙের আধিক্য মাঝারি এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। পত্রফলক মাঝারি আকারের ও মাঝারি ধরনের চওড়া, পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারি।

মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা বেশি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা কম। পার্শ্বের পত্রফলকে মাঝারি সংখ্যক বড় আকারের উপপত্র দেখা যায়।

আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর চামড়ার রং হলুদ, চামড়ার মসৃণতা মাঝারি, শাসের রং হালকা হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট এবং চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত থাকে।

শুষ্ক পদার্থ ১৭.৩৩-২০.৮০%। অঙ্কুর মাঝারি আকারের ও কনিক্যাল আকৃতির, গোড়ার দিকে খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও হালকা লোমযুক্ত।

অগ্রভাগ মাঝারি, এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি বেশি এবং মাঝারি লোমযুক্ত। সাধারণ তাপমাত্রায় ৬ মাসে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।

জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩৫.৭৮-৫৬.৩২ টন।

এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী। সাধারণ তাপমাত্রায় জাতটি ৫-৬ মাস সংরক্ষণযোগ্য এবং সুপ্তাবস্থা বিদ্যমান থাকায় জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

বারি আলু-৬৩ বাংলাদেশে নিজস্ব সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাতটি এদেশের

আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৬৩’ জাত হিসেবে ২০১৫ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৬ টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারী ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি মধ্যম। পাতা মাঝারী আকারের ও মধ্যম ঢেউ খেলানো। পাতায় সবুজ রঙের আধিক্য মাঝারী এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি মধ্যম। পত্রফলক মধ্যম আকারের ও মাঝারী ধরনের চওড়া পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারী। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা বেশি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা মাঝারী। পাশের্¡র পত্রফলকে মাঝারী সংখ্যক বড় আকারের উপপত্র দেখা যায়। আলু গোলাকার থেকে খাটো ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারের। আলুর চামড়ার রং আপেলের মতো লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং হলুদ। চোখ মধ্যম গভীর এবং চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত নয়। শুষ্ক পদার্থ ১৯.২২ (১৭.৯২-২১.৮২%)। অঙ্কুর মাঝারী আকারের ও ওভোয়েড আকৃতির, গোড়ার দিকে খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও হালকা লোমযুক্ত। অগ্রভাগ মাঝারী, এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুব

বেশি এবং হালকা লোমযুক্ত। সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩২.৩০-৫১.৬৭ টন। জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার আলু হিসেবে উপযোগী  
  
বারি আলু-৬৬ (পামেলা)

ফ্রান্স থেকে সংগৃহীত পামেলা জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৬৬ (পামেলা)’ জাত হিসেবে ২০১৫ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৮টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা-প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ, মাঝারি ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুব বেশি।

পাতা মাঝারি আকারের ও খুব কম ঢেউ খেলানো। পাতায় সবুজ রঙের আধিক্য মাঝারি এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি বেশি।

পত্রফলক মাঝারি আকারের ও মাঝারি ধরনের চওড়া এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারি। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা খুবই কম। পার্শ্বের পত্রফলকে খুবই কম সংখ্যক মাঝারি আকারের উপপত্র দেখা যায়।

আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রং লাল, শাঁসের রং হালকা হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট এবং চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত।

শুষ্ক পদার্থ ১৯.৪৭% (১৭.৩০-২১.৫৫%)। অঙ্কুর মাঝারি আকারের ও ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল আকৃতির, গোড়ার দিকে খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও বেশ লোম দেখা যায়।

অগ্রভাগ মাঝারি, এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি বেশি এবং মাঝারি লোমযুক্ত। সাধারণ তাপমাত্রায় ৯০-৯৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।

জীবনকাল ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ২৫.৫২-৪৬.০৬ টন।জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৬৮ (আটলানটিক)

ইউ.এস.এ থেকে সংগৃহীত আটলানটিক জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৬৮ (আটলানটিক)’ জাত হিসেবে ২০১৫ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৬টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা-প্রশাখা মধ্যম। কাণ্ড সবুজ, মাঝারি ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম।

পাতা মাঝারি আকারের ও খুবই কম ঢেউ খেলানো। পাতায় সবুজ রঙের আধিক্য মাঝারি এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুবই কম।

পত্রফলক মাঝারি আকারের ও মাঝারি ধরনের চওড়া এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারি। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা মাঝারি। পার্শ্বের পত্রফলকে খুবই কম সংখ্যক মাঝারি আকারের উপপত্র দেখা যায়।

আলু গোলাকার (চাপা) ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি, রং হলুদ, শাঁসের রং সাদা এবং চোখের গভীরতা মাঝারি। চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত নয়।

শুষ্ক পদার্থ ১৮.২৭-২২.৫৭%। অঙ্কুর মাঝারি আকারের ও ওভোয়েড আকৃতির, গোড়ার দিকে বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও মাঝারি লোমযুক্ত।

অগ্রভাগ বড়, এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম এবং মাঝারি লোমযুক্ত। সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।

জীবনকাল ৮৫-৯০ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ১৯.১৫-৪৫.৫১ টন।

জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

বারি আলু-৭০ (ডেসটিনি) নেদারল্যান্ড থেকে সংগৃহীত ডেসটিনি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৭০ (ডেসটিনি)’ জাত হিসেবে ২০১৬ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৭টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা-প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ, মাঝারি ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি মাঝারি।

পাতা বড় আকারের ও খুব কম ঢেউ খেলানো। পাতা গাঢ় সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম।

পত্রফলক মাঝারি আকারের ও মাঝারি ধরনের চওড়া এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারি। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা বেশি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা মাঝারি। পার্শ্বের পত্রফলকে কম সংখ্যক বড় আকারের উপপত্র দেখা যায়।

আলু খাটো ডিম্বাকৃতির থেকে গোলাকার ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রং হলুদ, শাঁসের রং হলুদ।

চোখের গোড়ার দিকের রং লাল ও গভীরতা মাঝারি। চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত নয়।

শুষ্ক পদার্থ ২০.৫৯% (২০.০৫-২১.৯৩%)। অঙ্কুর মাঝারি আকারের ও ওভোয়েড আকৃতির, গোড়ার দিকে খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও মাঝারি লোমযুক্ত।

অগ্রভাগ মাঝারি, এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম এবং কম লোমযুক্ত। সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।

জীবনকাল ৮৫-৯০ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩২.১৬ (২৮.৬৬-৩৮.২৯) টন।

এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

বারি আলু-৭২

আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র, লিমা, পেরু থেকে সংগৃহীত (সিআইপি-১৩৯)}

জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি

আলু-৭২’ জাত হিসেবে ২০১৬ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ও ইন্টারমিডিয়েট টাইপ। কাণ্ড সবুজ-বেগুনী এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুব বেশি। মধ্য

শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম। পাতা গাঢ় সবুজ এবং মাঝারী আকারের। মধ্য শিরায় ও কচি পত্রফলকের কিনারায়

এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি নেই। আলু খাটো ডিম্বাকৃতি এবং মাঝারী থেকে বড় আকারের। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃণ।

আলুর শাসের রং হলুদ। চোখ অগভীর। শুষ্ক পদার্থ ১৮.৭৫ ক্ট ০.১১%। অঙ্কুর মাঝারী ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল, গোড়ার দিকে

বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিকে দুর্বল লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী ও লোমমুক্ত।

সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবনকাল ৮৫-৯০ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড়

ফলন হেক্টরপ্রতি ২১.৮৫ (১১.৩২-৩৭.৫৩) টন। এ জাতটি তাপ ও লবণাক্ততা সহনশীল এবং খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৭৩

আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র, লিমা, পেরু থেকে সংগৃহীত {(বংশ 391925.2 × C92.030 )(সিআইপি-১২৭)} জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৭৩’ জাত হিসেবে ২০১৬ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪/৬টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এতে সামান্য এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি আছে।

পাতা গাঢ় সবুজ ও মাঝারি আকারের এবং কম ঢেউ খেলানো। মধ্য শিরায় ও শীর্ষ মুকুলের কচি পত্রফলকের কিনারায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি নেই, তবে বোঁটায় উপরিভাগে সামান্য এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি আছে।

আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাটে ধরনের ও মধ্যম আকারের। আলুর রং সাদা (ক্রীম), চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং ক্রীম।

চোখ হালকা গভীর। শুষ্ক পদার্থ ১৮.৮৫ ± ০.৪১%।

অঙ্কুর মাঝারি ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল, গোড়ার দিকে মাঝারি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিকে মাঝারি লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারি ও দুর্বল এন্থোসায়ানিন আছে এবং খুব দুর্বল লোমযুক্ত।

সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।

জীবনকাল ৮৫-৯০ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ২১.৮৫ (১১.৩২-৩৭.৫৩) টন।

এ জাতটি তাপ সহনশীল এবং খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৭৪ (বারসেলোনা)

নেদারল্যান্ড থেকে সংগৃহীত বারসেলোনা (বংশ গড়হফরধষ দ্ধ ঋবষংরহধ) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৭৪ (বারসেলোনা)’ জাত হিসেবে ২০১৭ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৫টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা-প্রশাখা খুবই কম। কাণ্ড সবুজ, মাঝারি ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি মাঝারি।

পাতা মাঝারি আকারের ও কম ঢেউ খেলানো। পাতা মাঝারি সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুবই কম।

পত্রফলক বড় আকারের ও চওড়া এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারি। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা মাঝারি। পার্শ্বের পত্রফলকে মাঝারি আকারের কম সংখ্যক উপপত্র দেখা যায়।

আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রং হলুদ, শাঁসের রং ক্রীম।

চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত।

শুষ্ক পদার্থ ১৭.৬৫ (১৬.৩৬-১৯.২৬)%।

অঙ্কুর মাঝারি আকারের ও কনিক্যাল আকৃতির, গোড়ার দিকে বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও বেশি লোমযুক্ত।

অগ্রভাগ ছোট, এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম এবং কম লোমযুক্ত।

সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।

জীবনকাল ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।

গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪৬.৬১ (৩৭.৩৮-৬৭.৫১) টন।

অন্য জাতের তুলনায় ৬৫ দিনে ফলন {২৭.১৩ (২২.৪০-৪০.৬৩) টন/হেক্টর} আগাম জাত হিসেবে জাতটি খুবই ভালো।

বারি আলু-৭৫ (মন্টেকার্লো)

নেদারল্যান্ড থেকে সংগৃহীত মন্টেকার্লো জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৭৫ (মন্টেকার্লো)’ জাত হিসেবে ২০১৭ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৭টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা-প্রশাখা খুবই কম। কাণ্ড সবুজ, মাঝারি ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি বেশি।

পাতা মাঝারি আকারের ও কম ঢেউ খেলানো। পাতা মাঝারি সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুবই কম।

পত্রফলক মাঝারি ধরনের ও মাঝারি চওড়া এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারি। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা কম। পার্শ্বের পত্রফলকে মাঝারি আকারের কম সংখ্যক উপপত্র দেখা যায়।

আলু খাটো ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রং লাল, শাঁসের রং সাদা।

চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত।

শুষ্ক পদার্থ ১৭.৮১ (১৬.৩৭-১৯.০৭)%।

অঙ্কুর মাঝারি আকারের ও ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল আকৃতির, গোড়ার দিকে বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও খুব বেশি লোমযুক্ত।অগ্রভাগ বড়, এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি মাঝারি এবং খুব বেশি লোমযুক্ত।সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।জীবনকাল ৭০-৭৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩৭.২৫ (২৩.৬২-৫৩.২৩) টন।জাতটি সবচেয়ে কম সময়ে পরিপক্ক হয় এবং খাবার আলু হিসেবে ভালো।

বারি আলু-৭৬ (কারুসো)

নেদারল্যান্ড থেকে সংগৃহীত কারুসো (বংশ SA 2952/72 × SA 92-352-6) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৭৬ (কারুসো)’ জাত হিসেবে ২০১৭ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৭টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা-প্রশাখা মাঝারি। কাণ্ড সবুজ, মাঝারি ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুবই কম।

পাতা মাঝারি আকারের ও কম ঢেউ খেলানো। পাতা মাঝারি সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুবই কম।

পত্রফলক মাঝারি আকারের ও চওড়া মাঝারি এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারি। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা খুবই কম। পার্শ্বের পত্রফলকে মাঝারি আকারের খুবই কম সংখ্যক উপপত্র দেখা যায়।

আলু খাটো ডিম্বাকৃতি, গোলাকার ও মাঝারি আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রং হলুদ, শাঁসের রং হালকা হলুদ।

চোখের গভীরতা মাঝারি ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত নয়।

শুষ্ক পদার্থ ২০.৫৪ (১৮.৩৬-২২.৪০)%।

অঙ্কুর মাঝারি আকারের ও ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল আকৃতির, গোড়ার দিকে কম পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও কম লোমযুক্ত।

অগ্রভাগ মাঝারি, এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম এবং কম লোমযুক্ত।সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।জীবনকাল ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩৫.৯৯ (২৭.৭৪-৪৪.৪০) টন।জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

বারি আলু-৭৭ (সার্পো মিরা)

ডেনমার্ক থেকে সংগৃহীত সার্পো মিরা জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি আলু-৭৭ (সার্পো মিরা)’ জাত হিসেবে ২০১৭ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন লিফি টাইপ এবং গড়ে ৪-৬টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা-প্রশাখা খুবই কম। কাণ্ড সবুজ, মাঝারি ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি বেশি।

পাতা মাঝারি আকারের ও কম ঢেউ খেলানো। পাতা মাঝারি সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি মাঝারি।

পত্রফলক বড় আকারের ও চওড়া এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারি। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা খুবই কম। পার্শ্বের পত্রফলকে মাঝারি আকারের খুবই কম সংখ্যক উপপত্র দেখা যায়।

আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রং লাল, শাঁসের রং হালকা হলুদ।

চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত।

শুষ্ক পদার্থ ১৯.৭২ (১৭.৬৮-২০.৭৬)%।

অঙ্কুর মাঝারি আকারের ও ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল আকৃতির, গোড়ার দিকে খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও কম লোমযুক্ত।

অগ্রভাগ মাঝারি, এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি বেশি এবং কম লোমযুক্ত।সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।জীবনকাল ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩৩.৪০ (২৭.৯৫-৪২.৪৭) টন।এ জাতটি নাবিধ্বসা রোগ প্রতিরোধী এবং খাবার আলু হিসেবে ভালো বারি আলু-৭৮ (সিআইপি-১১২)আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র, লিমা, পেরু থেকে (বংশ: 65-ZA-5 × CFK 69.1) জাতটি দেশে যাচাই-বাছাই করে পরে ২০১৭ সালে অনুমোদিত হয়।গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪/৬টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড গাঢ় সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি নেই।পাতা গাঢ় সবুজ এবং মাঝারি আকারের। পাতা কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি হালকা/নেই।

আলু গোলাকার এবং মাঝারি আকারের। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং হলুদ।চোখ হালকা গভীর। শুষ্ক পদার্থ : ১৮.৭৫%।

অঙ্কুর মাঝারি ওভোয়েড, গোড়ার দিকে বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক মাঝারি লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারি।

সাধারণ তাপমাত্রায় ১০০-১০৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।

জীবনকাল ৮৫-৯০ দিন।

গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪৬.৩৮ (৩৩.৯৮-৬১.৩৫) টন।

জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৭৯ (সিআইপি-১২৬)আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র, লিমা, পেরু থেকে সংগৃহীত জাতটি যাচাই-বাছাই করে ২০১৭ সালে অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৬টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ, সবল এবং অধিক এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি আছে।

পাতা কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের মধ্যম বিস্তৃতি আছে।

আলু লম্বাটে, মধ্যম-বড় আকারের। আলুর রং লাল, চামড়া হালকা অমসৃণ। আলুর শাসের রং ক্রীম।

চোখ অগভীর। শুষ্ক পদার্থ ১৮.৮৫%।

অঙ্কুর মাঝারি কনিক্যাল, গোড়ার দিক অধিক পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক অধিক লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারি।

অঙ্কুরোদগম সাধারণ তাপমাত্রায় ১০০-১০৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।

জীবনকাল ৮৫-৯০ দিন।

গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪২.৯২ (৩৫.২৩-৫৪.৪৯) টন।

এ জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৮১ গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৬টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি নেই।

পাতা কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুবই কম।

৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।

আলু খাটো ডিম্বাকৃতি, গোলাকার মধ্যম আকারের। আলুর রং হলুদ, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং হালকা হলুদ।

চোখ মধ্যম গভীর।

অঙ্কুর মাঝারি আকারের ও ওভোয়েড আকৃতির, গোড়ার দিকে খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও খুব বেশি লোমযুক্ত। অগ্রভাগ মাঝারি ধরনের।

গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪২.০৭ (৩৩.৩৮-৫৩.১৬) টন।

শুষ্ক পদার্থ ২০.০৩ ± ১%।

বারি আলু-৮০

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৫টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা-প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ, মাঝারি ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি মাঝারি।

পাতা মাঝারি আকারের ও কম ঢেউ খেলানো। পাতা মাঝারি সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি মাঝারি।

পত্রফলক মাঝারি আকারের, চওড়া ও মাঝারি এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারি। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা কম। পার্শ্বের পত্রফলকে মাঝারি আকারের কম সংখ্যক উপপত্র দেখা যায়।

৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।

আলু খাটো ডিম্বাকৃতি, গোলাকার ও মাঝারি আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রং হলুদ, শাঁসের রং ক্রীম।

চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত নয়।

অঙ্কুর মাঝারি আকারের ও কনিক্যাল আকৃতির, গোড়ার দিকে বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও বেশি লোমযুক্ত।

অগ্রভাগ মাঝারি, এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি মাঝারি এবং কম লোমযুক্ত।

গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩৩.৯৫ (২১.৬২-৪৪.৯৮) টন।

শুষ্ক পদার্থ ১৮.০৬ ± ১%।

এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।

বারি আলু-৮২

গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারি

ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুবই বেশি। পাতা মাঝারি আকারের ও কম ঢেউ খেলানো। পাতা গাঢ়

সবুজ এবংমধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুবই বেশি। পত্রফলক মাঝারি আকারের চওড়া ও মাঝারি ধরনের এবং

পত্রফলকের উপরের দিক মসৃণ। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা কম।

পার্শ্বের পত্রফলকে বড় আকারের মাঝারি সংখ্যক উপপত্র দেখা যায়। ৮৫-৯০ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু

ডিম্বাকৃতি থেকে লাল ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রং বেগুনী শাঁসের রং হলুদ। চোখ অগভীর

ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত।

উচ্চ ফলনশীল {৪২.৪৯ (২৫.৭১-৫১.৬০) টন/হে:}, এবং শুষ্ক পদার্থ সমৃদ্ধ ২০.০৭ (১৭.৫৫-২৪.৮৫%)। আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি ও চামড়ার রং বেগুনী। এ জাতটি খাবার আলু হিসাবে উপযোগী।

বারি আলু-৮৩ (সিমেগা)

গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারি ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম। পাতা মাঝারি আকারের ও কম ঢেউ খেলানো। পাতা সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি নেই। পত্রফলক মাঝারি আকারের চওড়া ও মাঝারি ধরনের এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারি ধরনের। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা বেশি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা মাঝারি। পার্শ্বের পত্রফলকে বড় আকারের মাঝারি সংখ্যক উপপত্র দেখা যায়। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রং হলুদ শাঁসের রং হালকা হলুদ। চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত ।

আগাম জাত (৬৫ দিনে গড় ফলন ৩০.৭৮ টন/হে:), উচ্চ ফলনশীল {৪৪.৬৩ (৩৮.১৮-৫০.৫২) টন/হে:}, খেতে সুস্বাদু, আলু হলুদ চামড়ার ডিম্বাকৃতি, বড় আকারের আলুর পরিমাণ (৭০.০৫% >৪০মি.মি. এর বেশি) এবং সুপ্তিকালবেশি (৭০-৭৫ দিন)। জাতটি সাধারণ তাপমাত্রায় ২ মাস এর বেশি সময় সংরক্ষণ করা যায়। শুষ্ক পর্দাথ- ১৮.৬৩ (১৬.৮৬-২০.০২)%। এই জাতটি রপ্তানী উপযোগী।

**বারি আলু-৮৪ (মেমফিস)**

গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা-প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ, মাঝারি ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি মাঝারি।

পাতা মাঝারি আকারের ও কম ঢেউ খেলানো। পাতা সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি মাঝারি।

পত্রফলক মাঝারি আকারের ও চওড়া ধরনের এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারি।

মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা বেশি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা মাঝারি। পার্শ্বের পত্রফলকে বড় আকারের মাঝারি সংখ্যক উপপত্র দেখা যায়।

৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।

আলু ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রং লাল, শাঁসের রং হালকা হলুদ।

চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত।

উচ্চ ফলনশীল {৪৩.১৭ (৩১.৭২-৫২.৩৫) টন/হেক্টর}, আলু লাল চামড়ার ডিম্বাকৃতি এবং রোগ ও পোকামাকড়ের প্রকোপ কম।

বড় আকারের আলুর পরিমাণ ৬০ শতাংশের বেশি এবং সুপ্তিকাল ৬০-৬৫ দিন থাকায় এই জাতটির রপ্তানিযোগ্যতা রয়েছে।

জাতটি সাধারণ তাপমাত্রায় ২ মাস সংরক্ষণযোগ্য।

শুষ্ক পদার্থ- ১৮.৭২ (১৫.৯৭-২১.৬৮)%।

**এই জাতটি রপ্তানিযোগ্য।**

বারি আলু-৮৫ (সেভেন ফোর সেভেন)

গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারি ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুবই কম। পাতা মাঝারি আকারের ও খুবই কম ঢেউ খেলানো। পাতা গাঢ় সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি নেই। পত্রফলক মাঝারি আকারের চওড়া ও মাঝারি ধরনের এবং পত্রফলকের উপরের দিক মসৃণ। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা কম । পার্শ্বের পত্রফলকে মাঝারি আকারের কম সংখ্যক উপপত্র দেখাযায়। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু

ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রং হলুদ শাঁসের রং সাদা। চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে

বিন্যস্ত। শুষ্ক পর্দাথ- ১৭.৮০ (১৪.৬৪-১৯.৭২)%। আলু হলূদ রংয়ের ও ডিম্বাকৃতি। আগাম জাত (৬৫ দিনে গড় ফলন ৩১.২০ টন/হে:), উচ্চ ফলনশীল {৪৬.১৫ (৩৮.৯৪-৫৪.৪৫) টন/হে:}। এ জাতটি খাবার আলু হিসাবে উপযোগী।

বারি আলু-৮৮:

গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারি ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম। পাতা মাঝারি আকারের ও খুবই কম ঢেউ খেলানো। পাতা মাঝারি ধরনের সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম। পত্রফলক মাঝারি আকারের ও চওড়া ধরনের এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারি।মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা খুবই কম। পার্শ্বের পত্রফলকে মাঝারিআকারের খুবই কম সংখ্যক উপপত্র দেখা যায়। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি,ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রং লাল শাঁসের রং হলুদ। চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। আগাম জাত (৬৫ দিনে গড় ফলন ৩৬.৮৫ টন/হে:), উচ্চ ফলনশীল {৪৮.১৭ (৩২.২৭-৬২.০৯) টন/হে:}, আলু লাল চামড়ার ও লম্বা ডিম্বাকৃতি এবং রোগ ও পোকামাকড়ের প্রকোপ কম। শুষ্ক পর্দাথ- ১৯.৩০ (১৭.৬৩-২১.২৯)%। এ জাতটি খাবার আলু হিসাবে উপযোগী।

বারি আলু-৮৯ (ফরটাস) :গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা-প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ, মাঝারি ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুবই কম।পাতা মাঝারি আকারের ও কম ঢেউ খেলানো। পাতা সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি নেই।পত্রফলক মাঝারি আকারের, চওড়া ও মাঝারি ধরনের এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারি ধরনের।

মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা খুবই কম। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা খুবই কম। পার্শ্বের পত্রফলকে মাঝারি আকারের খুবই কম সংখ্যক উপপত্র দেখা যায়।

৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।

আলু ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রং হলুদ, শাঁসের রং হালকা হলুদ।

চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত।

বৈশিষ্ট্য:

* আগাম জাত (৬৫ দিনে গড় ফলন ৩০.৫৩ টন/হেক্টর)
* উচ্চ ফলনশীল {৪২.৯৩ (৩৪.৮০-৫০.৬৩) টন/হেক্টর}
* আলু হলুদ চামড়ার ডিম্বাকৃতি
* বড় আকারের আলুর পরিমাণ (৬৭.২৬% >৪০ মি.মি. এর বেশি)
* সুপ্তিকাল বেশি (৭০-৭৫ দিন)
* জাতটি সাধারণ তাপমাত্রায় ২ মাসের বেশি সময় সংরক্ষণযোগ্য
* শুষ্ক পদার্থ ১৮.৩৩ (১৭.৫৫-১৯.৫৮)%জাতটি রপ্তানিযোগ্য

বারি আলু-৯০ (এলোয়েট) গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা-প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ, মাঝারি ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি বেশি।পাতা মাঝারি আকারের ও কম ঢেউ খেলানো। পাতা সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি বেশি।পত্রফলক মাঝারি আকারের ও চওড়া ধরনের এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারি।মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা খুবই কম। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা খুবই কম। পার্শ্বের পত্রফলকে মাঝারি আকারের খুবই কম সংখ্যক উপপত্র দেখা যায়।৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।আলু ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রং লাল, শাঁসের রং হলুদ।চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত।উচ্চ ফলনশীল {৫০.২৪ (৪৪.০৩-৫৭.৩৩) টন/হেক্টর}, আলু লাল রংয়ের ডিম্বাকৃতির ও বড় আকারের আলুর পরিমাণ (৬০.৪১% >৪০ মি.মি. এর বেশি) এবং সুপ্তিকাল বেশি (৮০-৮৫ দিন)।জাতটি সাধারণ তাপমাত্রায় ২ মাসের বেশি সময় সংরক্ষণ করা যায়।শুষ্ক পদার্থ ১৮.৪৯ (১৭.৫৫-১৯.১২)%।এই জাতটি নাবীধ্বসা রোগ প্রতিরোধী।জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

বারি আলু-৯১ (ক্যারোলাস) গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা-প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ, মাঝারি ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম।

পাতা মাঝারি আকারের ও কম ঢেউ খেলানো। পাতা মাঝারি সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি নেই।

পত্রফলক মাঝারি আকারের, চওড়া ও মাঝারি ধরনের এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারি।মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা খুবই কম। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা খুবই কম। পার্শ্বের পত্রফলকে মাঝারি আকারের কম সংখ্যক উপপত্র দেখা যায়।৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।আলু খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতি, মাঝারি আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রং হলুদ (লাল রংয়ের শেড আছে), শাঁসের রং হলুদ।চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত।আলু খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতি ও হলুদ চামড়ার (লাল রংয়ের শেড আছে), সুপ্তিকাল বেশি (৭০-৭৫ দিন)।জাতটি সাধারণ তাপমাত্রায় ২ মাসের বেশি সময় সংরক্ষণ করা যায়।উচ্চ ফলনশীল {৩৭.৭৪ (৩৪.৯৫-৪১.০৫)} টন/হেক্টর।শুষ্ক পদার্থ ১৮.৮০ (১৮.১০-১৯.৯৩)%।জাতটি নাবীধ্বসা রোগ প্রতিরোধী।

**আলুর উৎপাদন প্রযুক্তি**আলু বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। সাধারণত ধান ও গমের পরই আলুর স্থান। বর্তমানে চাষের জমির পরিমাণ ও ফলনের হিসেবে ধানের পরই আলুর স্থান। একক সময়ে একক জমিতে সর্বাধিক উৎপাদনের কারণে দিন দিন আলু চাষে জমির পরিমাণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।গত ২০১৬-২০১৭ মৌসুমে **৪.৯৯ লক্ষ হেক্টরে মোট ১০২ লক্ষ টন** আলু উৎপাদিত হয়, যার একক ফলন প্রতি হেক্টরে ছিল **২০.৪৪ টন** (কৃষি ডাইরি ২০১৯)।

আলুর মোট উৎপাদন দেশের চাহিদার তুলনায় বেশি বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেন। কারণ এখনও আলুকে আমাদের দেশে সবজি হিসেবে চিন্তা করা হয়। যদিও আলুর বহুবিধ ব্যবহার ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। চিপস্, ক্রিপস, ফ্লেস্ক ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরিতে আলু ব্যবহার হচ্ছে এবং দিন দিন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

রপ্তানির মাধ্যমে আলু ফসলের নতুন দিগন্ত উন্মোচন হয়েছে। আলু ফসলের গুরুত্ব অনেক গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বীজ আলু, খাবার আলু, আগাম আলু, প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য আলু ও রপ্তানির যোগ্য আলু উৎপাদনের জন্য কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করা দরকার।

নিম্নে আলু উৎপাদনের পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হলো।

### **জমি নির্বাচন**

আলু ফসল যে কোনো মাটিতে হতে পারে। তবে **বেলে দো-আঁশ থেকে দো-আঁশ মাটি** আলু চাষের জন্য উত্তম। উঁচু থেকে মাঝারি উঁচু জমি যেখানে **সেচ ও নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা** আছে, সে সকল জমি নির্বাচন করতে হবে। জমিটি অবশ্যই **রৌদ্র উজ্জ্বল** হতে হবে। জমিটিতে অবশ্যই **একবার ধান চাষ** করতে হবে। আগাম ধান আবাদ করা জমি যেখানে ধান কাটার পরই আলুর আবাদ করা সম্ভব, সে সকল জমি নির্বাচন করা সবচেয়ে ভালো।

### **জাত নির্বাচন**

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই এ পর্যন্ত **আলুর মোট ৯১টি জাত** (যার মধ্যে **বারি আলু হিসেবে ৮০টি**) অবমুক্ত করেছে। মুক্তায়িত জাতগুলোর মধ্যে রয়েছে:

* **খাবার আলু**
* **প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী আলু**
* **রপ্তানিযোগ্য আলু**
* **রোগপ্রতিরোধী আলু**
* **আগাম আলু**
* **সাধারণ তাপমাত্রায় সংরক্ষণযোগ্য আলু**

এদের মধ্য থেকে প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক জাত নির্বাচন করতে হবে।

### **জমি তৈরি**

মাটিতে “জোঁ” আসার পর **গরুর লাঙ্গল বা পাওয়ার টিলার/ট্রাক্টর** দ্বারা গভীরভাবে **আড়াআড়ি চাষ** ও **মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে** করে প্রস্তুত করতে হবে। আড়াআড়িভাবে **কমপক্ষে ৪টি চাষ** দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন **জমিতে বড় মাটির ঢেলা না থাকে** এবং **মাটি ঝুরঝুরে অবস্থায় আসে**। কারণ **বড় মাটির ঢেলা আলুর সঠিক বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে** এবং অনেক সময় **অসম ও বিকৃত আকার তৈরি করে**। জমি তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে **জমিতে সুষম সেচ প্রদান করা যায়**। সেজন্য **জমির উপরিভাগ সমতল** করতে হবে।

### **সারের পরিমাণ (হেক্টর, বিঘা, শতক)**

* **ইউরিয়া:** হেক্টরপ্রতি ৩২৫-৩৫০ কেজি, বিঘাপ্রতি ৪৪.৭৮-৪৮.২৩ কেজি, শতকপ্রতি ১.৩২-১.৪২ কেজি
* **টিএসপি:** হেক্টরপ্রতি ২০০-২২০ কেজি, বিঘাপ্রতি ২৭.৫৬-৩০.৩২ কেজি, শতকপ্রতি ০.৮১-০.৮৯ কেজি
* **এমপি:** হেক্টরপ্রতি ২৫০-৩০০ কেজি, বিঘাপ্রতি ৩৪.৪৩-৪১.৩২ কেজি, শতকপ্রতি ১.০২-১.২২ কেজি
* **জিপসাম:** হেক্টরপ্রতি ১০০-১২০ কেজি, বিঘাপ্রতি ১৩.৭৮-১৬.৫৪ কেজি, শতকপ্রতি ০.৪০-০.৪৯ কেজি
* **জিংক সালফেট:** হেক্টরপ্রতি ৮-১০ কেজি, বিঘাপ্রতি ১.১০-১.৩৮ কেজি, শতকপ্রতি ০.০৩২-০.০৪০ কেজি
* **বোরিক এসিড (প্রয়োজনবোধে):** হেক্টরপ্রতি ৬-৯ কেজি, বিঘাপ্রতি ০.৮৩-১.২৪ কেজি, শতকপ্রতি ০.০২৪-০.০৩৭ কেজি
* **গোবর:**

**সারের প্রয়োগ পদ্ধতি:** গোবর ও জিংক সালফেট **শেষ চাষের সময়** জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক **ইউরিয়া**, সম্পূর্ণ **টিএসপি**, **এমপি**, **জিপসাম** ও **বোরন সার** **রোপণের সময়** সারির দুই পার্শ্বে বা জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি **ইউরিয়া** **রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর**, অর্থাৎ **দ্বিতীয়বার মাটি তোলার সময়** উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

ভালো পদ্ধতিতে **বীজ রোপণের লাইনের উভয় পাশে ১০-১২ সেমি দূরে লাইন টেনে সার দেওয়া ভালো**। এতে **সারের সঠিক প্রয়োগ** হয়। সার প্রয়োগের পর **সাথে সাথে সার ও বীজ মাটি দিয়ে ভেলি তুলে ঢেকে দিতে হবে**।

**সেচ প্রয়োগ:** বীজ রোপণের পর জমিতে পরিমিত রস না থাকলে সেচ দেওয়া উত্তম, তবে খেয়াল রাখতে হবে **ক্ষেতে কোনোভাবেই পানি না দাঁড়ায়**। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন **পানিতে ভেলির ২/৩ অংশ পর্যন্ত ডুবে যায়**।

এছাড়াও **২-৩টি সেচ প্রয়োগ করা প্রয়োজন** হতে পারে:

* **২০-২৫ দিনের মধ্যে** স্টোলন বের হওয়ার সময়
* **৪০-৪৫ দিনের মধ্যে** গুটি বের হওয়া পর্যন্ত
* **পরে আলু বৃদ্ধির সময়**

জমি থেকে **আলু উঠানোর ৭-১০ দিন পূর্বে** মাটি ভেদে **সেচ প্রয়োগ বন্ধ** রাখতে হবে।

**দাঁদ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য:**

* **আলু রোপণের পর ৩০-৫০ দিনের সময়ে** জমিতে **কোনো অবস্থায় রসের ঘাটতি রাখা যাবে না**।
* **৬০-৬৫ দিনের পর** জমিতে **রসের আধিক্য হতে দেয়া যাবে না**।

**অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা:**

* **আলুর জমি সর্বদা আগাছামুক্ত রাখা উচিত**।
* **আলু লাগানোর ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে** আগাছা পরিষ্কার করে **দুই সারির মধ্যবর্তী স্থান কুপিয়ে উপরি সার প্রয়োগ** করতে হবে।
* **সার মিশ্রিত মাটি গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হবে**।
* **কোপানোর সময়** খেয়াল রাখতে হবে **আলু শিকড় বা স্টোলন না কাটে** এবং **মাটি দেওয়ার সময় গাছের পাতা মাটি চাপা না পড়ে**।
* **৫৫-৬০ দিন পর** প্রয়োজন হলে **পুনরায় আগাছা পরিষ্কার করে মাটি তুলে দিতে হবে**।
* **পরবর্তীতে কোনো কারণে আলু মাটির উপরে উন্মুক্ত হলে** তা **দেখার সাথে সাথে মাটি তুলে ঢেকে দিতে হবে**।
* **প্রয়োজনমতো রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন করতে হবে**।
* **রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে জমি থেকে দূরে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে**। এতে **ক্ষেতে আলুর মড়ক রোগসহ বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়**।

**রোগিং:**

* **মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদনে রোগিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ**।
* **গাছের বয়স ৩০-৩৫ দিন থেকে শুরু করে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত** নিয়মিত **আলুর জমিতে বিভিন্ন জাতের মিশ্রিত গাছ, অস্বাভাবিক এবং রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে**।
* **ভাইরাস রোগের ক্ষেত্রে** অত্যন্ত সতর্কতার সাথে **আলু গাছ মাটির নিচে আলুসহ উঠিয়ে অন্যত্র মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে**।
* **সকালে এবং বিকালে রোগিং এর জন্য উপযুক্ত সময়**।
* **সূর্যের বিপরীত দিকে মুখ করে রোগিং করতে হবে** যেন **পাতায় সকল লক্ষণ স্পষ্ট বুঝা যায়**।
* **রোগাক্রান্ত গাছ কোনো সুস্থ গাছের সঙ্গে না লাগে** এবং **শ্রমিকের হাতের স্পর্শ দ্বারাও যেন সুস্থ গাছ রোগ সংক্রমণ না হয়**।
* **বীজ ফসলের ক্ষেতে** বীজ আলু **মাটি ভেদ করে উঠে আসার পর থেকে হামপুলিং পর্যন্ত ৪/৫ দিন অন্তর অন্তর** ফসলের মাঠে যেয়ে **রোগিং করতে হবে**।
* **রোগমুক্ত মানসম্পন্ন আলু উৎপাদন করায় রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার**।

**হমপুলিং (গাছ উপড়ে ফেলা):**

* **হমপুলিং হলো গাছ টেনে উপড়ে ফেলা**।
* **হমপুলিং এর ৭-১০ দিন পূর্বে সেচ বন্ধ করতে হবে**।
* **বেলে মাটি হলে ৫-৭ দিন পূর্বে সেচ বন্ধ করা ভালো**।
* **বেশিদিন পূর্বে সেচ বন্ধ করলে বেলে মাটির আলুতে হিট ইনজুরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে**।
* **হমপুলিং করার সময় মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকলে গাছ ক্ষেত থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে**।
* **যদি পর্যাপ্ত রস না থাকে তবে গাছ দ্বারা পিলি ঢেকে দিতে হবে** যাতে **হিট ইনজুরি হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়**।

**ফসল কর্তন করে আলুর আকার ও ফলন দেখে হামপুলিং এর তারিখ নির্ধারণ করতে হবে**

মাঠে মাটির নিচে কিউরিং: হামপুলিং এর পর মাটি ও আলুর অবস্থার উপর নির্ভর করে ৭-১০ দিন পর্যন্ত মাটি নিচে রেখে আলুর ত্বক শক্ত করতে হবে। আলুর ত্বক শক্ত হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য আলু তুলে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা আলুর ত্বকে চাপ দিতে হবে। চামড়া না উঠলে বুঝা যাবে কিউরিং হয়েছে। অথবা চটের বস্তায় ২/৩ কেজি নমুনা আলু উঠিয়ে ঝাকুনি দিতে হবে। যদি ছাল না উঠে তবে বুঝা যাবে কিউরিং হয়েছে। বীজ আলু মাটির নিচে থাকা অবস্থায় প্রয়োজনে লাইনে মাটি দিয়ে আলু ঢেকে দিতে হবে যেন সূর্যালোকে আলুতে সবুজায়ন ও হিট ইনজুরি না হতে পারে।

আলু উঠানো/সংগ্রহ: শুষ্ক, উজ্জ্বল ও ভালো আবহাওয়াতে আলু উত্তোলন করতে হবে। এক সারির পর এক সারি কোদাল বা লাঙ্গল দিয়ে আলু উঠাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আলু আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। আলু উঠানোর পর প্রখর রৌদ্রে রাখা যাবে না। মাঠে প্রাথমিক বাছাইয়ের মাধ্যমে কাটা, ফাটা, আংশিক পচা আলু বাতিল হিসাবে পৃথক করতে হবে যেন ভালো আলুর গাদার সাথে মিশ্রিত হতে না পারে। মাঠে বস্তায় অথবা চট দ্বারা আবৃত ঝুড়িতে ভরে সতর্কতার সাথে অস্থায়ী শেডে পরিবহন করে আনতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আলুর বস্তা বা ঝুড়ি আছড়িয়ে ফেলে আলু ফাটিয়ে বা আলুর ছাল উঠিয়ে থেতলিয়ে ফেলা না হয়।

অস্থায়ী শেড নির্মাণ ও অস্থায়ী শেডে কিউরিং: আলু উৎপাদন মাঠ বা ব্লকের কাছাকাছি ছায়াযুক্ত ঠাণ্ডা ও সহজে বাতাস চলাচল করে এমন উপযোগী করে অস্থায়ী শেড তৈরি করতে হবে। মাঠ থেকে কেবলমাত্র প্রাথমিক বাছাইকৃত আলু শেডের মেঝেতে বিছিয়ে রাখতে হবে যেন আলুর স্তুপ ৪৫ সেমি এর বেশি উঁচু না হয়। এ অবস্থায় কমপক্ষে ৩-৫ দিন কিউরিং করতে হবে।

সর্টিং-গ্রেডিং: আলু সংরক্ষণ করার জন্য অবশ্যই ভালোভাবে বাছাই করা দরকার। বাছাই ভালো হলে সংরক্ষণ/রপ্তানিযোগ্য আলুর মান ভালো হবে। রোগাক্রান্ত, আঘাতপ্রাপ্ত, আংশিক কাটা, ফাটা, অসম আকৃতির ও অতীব সবুজায়নকৃত আলু সঠিকভাবে বাছাই করে পরে বস্তাবন্দী করতে হবে। বাছাইকৃত আলুতে দু-একটি রোগাক্রান্ত বা খারাপ আলু থাকলে অবশিষ্ট আলুর মান ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আলু রপ্তানির সময় জাহাজেই পচে নষ্ট হবে।

আলু সংরক্ষণ: সর্টিং-গ্রেডিং করার পর আলু নির্দিষ্ট সাইজের বস্তায় (৮০/৫০ কেজি) করে কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করতে হবে। বীজ আলু অবশ্যই কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করতে হবে। তবে কিছু পরিমাণ খাবার আলু কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে জাত ভেদে ৩-৫ মাস সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

**আলুর ক্ষতিকর প্রধান রোগ এবং সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা** আলু বীজ জমিতে বপন থেকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতিকর রোগ দ্বারা আলু গাছ ও বীজ আলু আক্রান্ত হয়। আলুর ক্ষতিকর প্রধান রোগের মধ্যে **নাবি ধ্বসা, ঢলে পড়া, দাঁদ, স্কাব বা স্টেম ক্যাঙ্কার, ব্ল্যাক লেগ এবং বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস রোগ** অন্যতম। এ সমস্ত রোগ দমনে সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে কৃষক পর্যায়ে আলুর লাভজনক উৎপাদন ব্যাহত হয়।

### **আলুর মড়ক বা নাবি ধ্বসা রোগ**

**লক্ষণ:** আলুর মড়ক রোগ বাংলাদেশের আলু উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। **Phytophthora infestans** নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগের আক্রমণে প্রথমে পাতায় **ছোপ ছোপ ভেজা হালকা সবুজ গোলাকার বা এলোমেলো দাগ** দেখা দেয়, যা দ্রুত **কালো হয়ে পচে যায়**। গাছের কাণ্ড এবং টিউবারেও এ রোগের আক্রমণ দেখা যায়। সকাল বেলা মাঠে গেলে **পাতার নিচে সাদা সাদা পাউডারের মত ছত্রাক** দেখা যায়। তীব্র আক্রমণে সম্পূর্ণ জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায়। নিম্ন তাপমাত্রা এবং কুয়াশাযুক্ত আবহাওয়ায় আক্রান্ত গাছ দ্রুত **লতাপাতা ও কাণ্ডসহ পচে যায়** এবং **২-৩ দিনের মধ্যেই মাঠের সমস্ত গাছই মরে যেতে পারে**। আক্রান্ত টিউবারের গায়ে ও ভিতরের অংশে **গাঢ় বাদামী থেকে কালচে দাগ** পড়ে।

**সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা:**

* **রোগ প্রতিরোধী বা সহনশীল জাত** যেমন- ‘বারি আলু-৪৬’, ‘বারি আলু-৫৩’, ‘বারি আলু-৭৭’ ব্যবহার করা যেতে পারে।
* **রোগমুক্ত বীজ** ব্যবহার করতে হবে।
* **আক্রান্ত জমিতে সেচ বন্ধ** করে দিতে হবে।
* **সারিতে ভালোভাবে মাটি উঁচু** করে দিতে হবে।
* **আগাম জাতের আলু চাষ** করতে হবে এবং **আগে সংগ্রহ** করতে হবে।
* **নিম্ন তাপমাত্রা, কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া ও বৃষ্টির পূর্বাভাস** পাওয়ার সাথে সাথে **রোগ প্রতিরোধের জন্য ৭-১০ দিন অন্তর** ম্যানকোজেব গোত্রের ছত্রাকনাশক যেমন- **ডাইথেন এম-৪৫/ইন্ডোফিল** প্রতি **লিটার পানিতে ২ গ্রাম** হারে স্প্রে করতে হবে।
* **জমিতে রোগ দেখা দেওয়া মাত্রই ৭ দিন অন্তর** নিম্নের যে কোনো একটি ছত্রাকনাশক বা ছত্রাকনাশকের মিশ্রণ স্প্রে করতে হবে:
  + **সিকিউর (২ গ্রাম/লিটার)** অথবা
  + **এক্রোভেট এম জেড (২ গ্রাম/লিটার)** অথবা
  + **মেলোডি ডুও ৪ গ্রাম + সিকিউর ২ গ্রাম (প্রতি লিটার পানিতে)** অথবা
  + **এক্রোভেট এম জেড ২ গ্রাম + সিকিউর ১ গ্রাম (প্রতি লিটার পানিতে)** অথবা
  + **মেলোডি ডুও ১ গ্রাম + এক্রোভেট এম জেড ২ গ্রাম (প্রতি লিটার পানিতে)**

রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হলে **আরও ঘন ঘন ঔষধ ছিটানোর প্রয়োজন** পড়তে পারে। ভেজা অবস্থায় জমিতে **ছত্রাকনাশক না দেয়াই ভালো**। যদি দিতেই হয়, তাহলে **প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ গ্রাম সাবানের গুড়া পাউডার** যোগ করে নিতে হবে। ছত্রাকনাশক **ভালভাবে ছিটাতে হবে** যাতে **পাতার নিচে ও উপরে ভালভাবে ভিজে যায়**। এ ক্ষেত্রে **সাধারণ স্প্রেয়ারের পরিবর্তে পাওয়ার স্প্রেয়ার** ভালো ফল দেয়।

**ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ (Bacterial Wilt)** **লক্ষণ:** ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ আলুর একটি মারাত্মক সমস্যা। **Ralstonia solanacearum** নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগে গাছ সাধারণত **সবুজ অবস্থায়ই ঢলে পড়ে**। গাছের **একটি শাখা বা এক অংশও ঢলে পড়তে পারে**। কাণ্ডের নিম্নাংশ ও শিকড় **অক্ষত থাকে**। কাণ্ডের ভিতরে **পরিবহন কলায় বাদামী বর্ণের উপস্থিতি** দেখা যায়, যা **কাণ্ড চিরলে স্পষ্ট বোঝা যায়**। আক্রান্ত গাছের কাণ্ড কেটে **পরিষ্কার পানিতে খাড়া করে রাখলে কিছুক্ষণ পর দুধের মতো সাদা উজ (পুঁজ) বের হয়**। সংগৃহীত আলুর **চোখে সাদা পুঁজের মতো দেখা যায়** এবং **আলু অল্প দিনের মধ্যেই পচে যায়**। বীজ আলুর ক্ষেত্রে **এক হেক্টর জমিতে যদি ১টি গাছ আক্রান্ত হয়**, তাহলে **সেই মাঠ থেকে বীজ আলু কখনই সংগ্রহ করা যাবে না**।

**অনুকূল আবহাওয়া:** আলুর ঢলে পড়া রোগ প্রধানত **তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা দ্বারা প্রভাবিত হয়**। সাধারণত **২৮-৩০°C তাপমাত্রা** এ রোগের জন্য সবচেয়ে অনুকূল। তবে **নিম্ন তাপমাত্রায়** আলুর কাণ্ডে ও টিউবারে এই জীবাণু **সুপ্ত অবস্থায় থাকে**। বাতাসের **আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০-৯০%** এ রোগের বৃদ্ধির জন্য খুবই সহায়ক।

**রোগের উৎস ও বিস্তার:** এই ব্যাকটেরিয়া **মাটিতে কিংবা আক্রান্ত আলুতে বেঁচে থাকে**। এছাড়াও **ফসলের পরিত্যক্ত অংশ ও বিকল্প পোষকেও বেঁচে থাকতে পারে**। মাটিতে **বৃষ্টি ও সেচের পানি, কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষকের পায়ের মাটি, চারা সংলগ্ন মাটি** ইত্যাদি দিয়েও এই জীবাণুর বিস্তার হতে পারে। এই জীবাণু **মাটিতে ৩০-৭৫ সেমি গভীরতা পর্যন্ত** স্বতন্ত্রভাবে বা শস্যাবশেষের মধ্যে বেঁচে থাকে। সাধারণত **আলু গাছের শিকড়ে জীবাণুর আক্রমণের সূচনা হয়**। অনেক সময় **আলুতে এ রোগের লক্ষণ সুপ্ত অবস্থায় থাকে** এবং **বাহির থেকে আক্রমণের কোনো লক্ষণ বোঝা যায় না**।

**সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা:**

* **প্রত্যায়িত অথবা রোগমুক্ত এলাকা থেকে সুস্থ ও রোগমুক্ত বীজ সংগ্রহ করতে হবে**।
* **বীজ আলু চাষের ক্ষেত্রে কাটা বীজ লাগানো পরিহার করতে হবে**।
* **আলু লাগানোর সময় জমিতে সর্বশেষ চাষের পূর্বে প্রতি হেক্টরে ২০-২৫ কেজি হারে স্ট্যাপল ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করতে হবে**।
* **বপনের পর যত শীঘ্র সম্ভব গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে**।
* **পরিমিত মাত্রায় সেচ প্রয়োগ করতে হবে**।
* **আক্রান্ত গাছ আলুসহ আশেপাশের মাটি দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে নষ্ট করে ফেলতে হবে**।
* **আক্রান্ত জায়গায় ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করতে হবে**।
* **সেচের প্রয়োজন হলে আক্রান্ত অংশ বাদ দিয়ে সেচ দিতে হবে**।
* **আক্রান্ত জমিতে পরবর্তীতে আলু, টমেটো, বেগুন, মরিচ, তামাক ইত্যাদি জাতীয় ফসল চাষ করা যাবে না**।
* **গম, ধান, ভুট্টা, কাউন, বার্লি, সরগাম, পেঁয়াজ, রসুন, কপি, গাজর ইত্যাদি ফসল দিয়ে শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে**।
* **বীজ আলু জমিতে ভুট্টা দ্বারা আন্তঃফসল চাষ করলে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ কম হয়**।
* **গ্রীষ্মকালে কয়েকবার জমি চাষ করে প্রখর রৌদ্রে মাটি শুকিয়ে নিতে হবে** এতে **মাটিতে অবস্থিত রোগ জীবাণু অনেক কমে যায়**।
* **এ রোগ দেখা মাত্র আক্রান্ত জমিতে সেচ প্রদান, নিড়ানী দেওয়া, মালচিং ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে**।
* **আলু লাগানোর পূর্বে জমিতে ধান থাকলে সে ধানের নাড়া শুকিয়ে মাটিতে বিছিয়ে পুড়ে ফেলতে হবে**। এতে **মাটির রোগ জীবাণু অনেকাংশে কমে যায়**।
* **যে জমি সব সময় ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে থাকে সে জমিতে বীজ আলু কখনই চাষ করা যাবে না**। কারণ **ভেজা জমিতে ব্যাকটেরিয়ার উপদ্রব বেশি হয়**।

**আলুর দাঁদ (স্ক্যাব) রোগ** **লক্ষণ:** আলুর দাঁদ রোগ বর্তমানে আলুর একটি মারাত্মক রোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই রোগে আক্রান্ত আলু কখনই **বীজ আলু হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না**। **Streptomyces scabies** নামক জীবাণুর আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। দাঁদ রোগে **আলুর টিউবারের উপরে উঁচু অমসৃণ বিভিন্ন আকারের বাদামী খসখসে দাগ** পড়ে। আক্রমণ বেশি হলে **পুরো টিউবারই দাগে ভরে যায়** এবং **অনেক সময় দাগগুলো দেবে যায়**। রোগের আক্রমণ সাধারণত **ত্বকেই সীমাবদ্ধ থাকে**।

**অনুকূল আবহাওয়া ও রোগের উৎস:** উচ্চ **তাপমাত্রা এবং উচ্চ আর্দ্রতা** এ রোগ বিস্তারে সহায়ক। এ রোগটি **বীজ ও মাটি বাহিত**। কোনো **পোষক গাছ ছাড়াই** এ রোগের জীবাণু **মাটিতে পাঁচ (৫) বছরের অধিক কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে**। সাধারণত **গাছে টিউবার আসার সময় কমপক্ষে ৩০ দিন পর্যন্ত যদি জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকে** অথবা **আলু গাছের বয়স ৬৫ দিন পর যদি জমিতে অতিরিক্ত রস থাকে** তাহলে এ রোগটি বেশি হয়। বিভিন্ন প্রকার ফসল যেমন **মূলা, গাজর, শালগমে** এই রোগের জীবাণু বহুদিন বেঁচে থাকে।

**সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা:**

* **রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে**।
* **বীজ আলু কোল্ড স্টোরেজ থেকে সংগ্রহের পরে স্প্রাউটিং এর পূর্বে প্রোভেক্স-২০০ (০.২%) বা ডাইথেন এম-৪৫ (০.২%) দিয়ে বীজ শোধন করে বপন করতে হবে**।
* **সেচের তারতম্যের কারণে অনেক সময় দাঁদ রোগের সূচনা হয়**।
* **আলু লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই মাটিতে রসের যেন ঘাটতি না হয়**।
* **আলুর টিউবার ধারণের সময় ৩৫-৫৫ দিন পর্যন্ত পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে**।
* **আলু উত্তোলনের আগে মাটিতে বেশি রস থাকলে আলু দাঁদ রোগে আক্রান্ত হতে পারে**।
* **গাছের বয়স ৭০ দিনের পর সেচ বন্ধ করতে হবে**।
* **বীজ আলু চাষের পূর্বে জমিতে সবুজ সার চাষ করতে হবে**।
* **শস্য পর্যায়ে জমিতে গম বা ডাল জাতীয় ফসল চাষ করতে হবে**।
* **সুষম সার (জৈব ও অজৈব) ব্যবহার করতে হবে**।

আলুর স্টেম ক্যান্সার (স্কার্ফ) রোগ লক্ষণ: আলুর স্কার্ফ রোগও আলুর একটি ক্ষতিকারক রোগ। Rhizoctonia solani প্রজাতির ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। কৃষক পর্যায়ে একে রাইজোকটনিয়া রোগ বলা হয়। এ রোগের প্রধান লক্ষণ হলো কাণ্ডের সাথে ছোট ছোট সবুজ টিউবার দেখা যায়। বড় গাছের গোড়ার দিকে কালো বর্ণের দাগ বা ক্ষতের সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রে গাছে বেশি শাখা-প্রশাখা দেখা দেয় এবং পাতা ভাইরাসের মত হালকা মোড়ানো দেখা যায়। গাছের কাণ্ড তুলনামূলকভাবে শক্ত হয়ে যায়, কাণ্ডের গিঁট মোটা হয়ে যায় ও কাণ্ড সহজেই মট করে ভেঙে যায়। আক্রান্ত আলুতে কালো কালো উঁচু দাগ পড়ে এবং বীজ হিসেবে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

অনুকূল আবহাওয়া ও রোগের উৎস: উচ্চ তাপমাত্রা এবং জমির উচ্চ আর্দ্রতা এ রোগ বিস্তারে সহায়ক। এ রোগটি বীজ ও মাটি বাহিত এবং প্রাথমিক উৎস আক্রান্ত বীজ।

দমন ব্যবস্থাপনা:

* প্রত্যায়িত অথবা রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে।
* ভালোভাবে অঙ্কুরিত বীজ আলু রোপণ করতে হবে।
* শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে।
* বীজ আলু মাটির বেশি গভীরে রোপণ পরিহার করতে হবে।
* প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম প্রোভেক্স ২০০ অথবা অটোস্টিন মিশিয়ে বীজ শোধন করে বপন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
* রোগের আক্রমণ বেশি হলে অটোস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে গাছের গোড়ার মাটি ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।
* কখনও জমিতে অতিরিক্ত পানি দেয়া যাবে না।

আলুর কালো পা রোগ লক্ষণ: আলুর কালো পা বীজ আলুর একটি প্রধান রোগ। Erwinia carotovora নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। মাঠে ও সংরক্ষিত আলুতে এ রোগ দেখা দেয়। মাঠে গাছের গোড়ায় কালো দাগ পড়ে বলে কালো পা এবং সংরক্ষণাগারে টিউবার আক্রান্ত হলে নরম পচা রোগ বলে। আক্রান্ত গাছের কাণ্ডের গোড়ার দিকে বাদামী থেকে কালো রঙের দাগ পড়ে এবং যা সহজেই সুস্থ অংশ থেকে আলাদা করা যায়। আক্রান্ত ডাল তুলে নাকের কাছে ধরলে এক ধরনের পচা আলুর মতো গন্ধ পাওয়া যায়। আক্রান্ত গাছের আলু পচে যায়।

অনুকূল আবহাওয়া ও রোগের উৎস: উচ্চ তাপমাত্রা এবং জমির উচ্চ আর্দ্রতা এ রোগ বিস্তারে সহায়ক। এ রোগটি বীজ ও মাটি বাহিত।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা:

* প্রত্যায়িত অথবা রোগমুক্ত বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
* অতিরিক্ত সেচ পরিহার করতে হবে।
* উচ্চ তাপ এড়ানোর জন্য আগাম চাষ করতে হবে।
* ভালোভাবে বাছাই করে হিমাগারে আলু সংরক্ষণ করতে হবে।
* আলু লাগানোর সময় জমিতে সর্বশেষ চাষের পূর্বে প্রতি হেক্টরে ২০-২৫ কেজি হারে স্ট্যাপল ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করতে হবে।
* বপনের পর যত শীঘ্র সম্ভব গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।
* স্ট্যাপল ব্লিচিং পাউডার প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম অথবা বোরিক এসিড প্রতি লিটার হালকা গরম পানিতে ৩০ গ্রাম দ্রবণে টিউবার শোধন করে বীজ আলু সংরক্ষণ করতে হবে।
* রোগ দেখা মাত্র পানি সেচ বন্ধ করতে হবে।
* আলুর কালো পা রোগে আক্রান্ত গাছ আলুসহ আশেপাশের মাটি দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে নষ্ট করে ফেলতে হবে।
* আক্রান্ত জায়গায় ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করতে হবে।
* সেচের প্রয়োজন হলে আক্রান্ত অংশ বাদ দিয়ে সেচ দিতে হবে।

**আলুর ভাইরাস রোগ** আলুর ভাইরাস রোগ আলুর ফলন কম হওয়ার অন্যতম কারণ। আমাদের দেশের কৃষকরা এই রোগ সম্পর্কে সচেতন নয় বিধায় ভাইরাস আক্রান্ত আলু বছরের পর বছর ব্যবহার করে। ফলে কৃষক দ্বারা উৎপাদিত আলুর ফলন অত্যন্ত কম।

আলুর ভাইরাস রোগসমূহের মধ্যে **আলুর পাতা মোড়ানো (PLRV), আলুর ভাইরাস ওয়াই (PVY), আলুর ভাইরাস এক্স (PVX) এবং আলুর ভাইরাস এস (PVS)** এ দেশের জন্য প্রধান।

এই সমস্ত ভাইরাস **এককভাবে অথবা যৌথভাবে** আলু গাছ আক্রমণ করে। সাধারণভাবে ভাইরাস আক্রান্ত আলু গাছ **আকারে ছোট, পাতা কোঁকড়ানো, হলুদ অথবা মোজাইকের রং হয় এবং খসখসে হয়** যা সহজেই নিবিড় পর্যবেক্ষণ করলে কৃষক সুস্থ গাছ থেকে ভাইরাস আক্রান্ত আলু গাছ আলাদা করতে পারবে।

ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হলে **আলুর আকার ছোট হয় এবং আলুর উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়**।

ভাইরাসসমূহ **জাব পোকা এবং স্পর্শের মাধ্যমে গাছ থেকে গাছে ছড়ায়**।

বাংলাদেশের আবহাওয়া **আলুর এই ভাইরাস রোগসমূহের বাহক জাব পোকা (Aphids) বংশ বিস্তারের জন্য অত্যন্ত উপযোগী**।

রোগমুক্ত বীজ আলু উৎপাদনের জন্য **আলুর ভাইরাস রোগসমূহ চেনা কৃষকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ**।

### **আলুর পাতা মোড়ানো ভাইরাস (PLRV)**

**লক্ষণ:জাব পোকার মাধ্যমে** আলুর এই ভাইরাস গাছ থেকে গাছে ছড়ায়।**আক্রান্ত গাছের পাতা উর্ধ্বমুখী হয়ে উপরের দিকে গুটিয়ে যায়**।**দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ হলে নিচের পাতা খসখসে, খাড়া ও উপরের দিকে গুটানো হয়**।**কখনও কখনও পাতার কিনারা শুকিয়ে যায়**।**গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় ফলে গাছ খাটো ও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে**।**এ রোগে আক্রান্ত হলে শতকরা ৪০-৮০% উৎপাদন হ্রাস পায় এবং আলুর আকার ছোট হয়**।

### **আলুর ওয়াই ভাইরাস (PVY)**

**লক্ষণ:**

**পাতা মোড়ানো ভাইরাসের পরই আলুর ওয়াই ভাইরাস সবচেয়ে ক্ষতিকর**।**এ রোগে ক্ষতির পরিমাণ ৯৫% পর্যন্ত হতে পারে এবং আলুর আকার অত্যন্ত ছোট হয়**।**এ রোগ জাব পোকা এবং স্পর্শ দুইভাবেই বিস্তার লাভ করে**।**আক্রান্ত গাছের পাতার শিরায় কালচে দাগ, পাতা মরে যেয়ে গাছে ঝুলে থাকা, গাছ বেটে ও কুঁকড়িয়ে যাওয়া** ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।**অনেক সময় পাতায় মৃদু মোজাইক লক্ষণও দেখা যায়**।

### **আলুর এক্স ভাইরাস (PVX)**

**লক্ষণ:**

**এ রোগে ৫-১৫% ফলন কমতে পারে**।**এটি একটি মারাত্মক স্পর্শক (Contact) ভাইরাস**।**গাছে এ রোগের লক্ষণ কদাচিৎ মোজাইক, হলদেভাব, ছোট পাতা, মরা বা থুবড়ে যাওয়া পাতা দেখা যায়**।**এ রোগের ফলে গাছ ও টিউবার ছোট হয়ে যায়**।**মরিচ, টমেটো, বথুয়া, ধুতুরা, তামাক ইত্যাদি এ ভাইরাসের বিকল্প পোষক হিসাবে কাজ করে**।

### **আলুর এস ভাইরাস (PVS)**

**লক্ষণ:**

**আলুর এস ভাইরাসের লক্ষণ বোঝা বেশ কঠিন**।**কোনো কোনো জাতের ক্ষেত্রে এ রোগে পাতার উপরে শিরা গভীর হয়ে যায়**।**পাতা তামাটে বর্ণ ধারণ করে ঝরে যেতে পারে**।**অনেক সময় পাতা খসখসে হয় এবং পাতায় মরা দাগ পড়ে**।**এ ভাইরাসের আক্রমণেও আলুর আকার ছোট হয়ে যায়**।

### **রোগের উৎস ও বিস্তার:**

**আক্রান্ত বীজ আলু, জাব পোকা এবং স্পর্শের মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার ঘটে**।**মিশ্র ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত আলু গাছের বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ দেখা যায়**।**আলু গাছ যখন পরিপক্কতার দিকে যায় তখন সাধারণত একই গাছে একাধিক ভাইরাস আক্রমণ করে**।**যৌথ ভাইরাস আক্রান্ত পাতাও কোঁকড়ানো ও খসখসে হয় এবং এতে কাল দাগ পড়ে**।

ভাইরাস রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা:

ভাইরাসমুক্ত প্রত্যায়িত বীজ আলু ব্যবহার করতে হবে।আগাম জাতের আলু চাষ করতে হবে, যা **নভেম্বরের ২৫ তারিখের (১১ কার্তিক) মধ্যে** করতে হবে এবং **আগাম সংগ্রহ** করতে হবে।জমি **আগাছামুক্ত** রাখতে হবে।জমির আশেপাশের **বিকল্প পোষক গাছ** যেমন- **টমেটো, তামাক, মরিচ, ধুতুরা, বথুয়া, ফোসকা বেগুন** ইত্যাদি থাকলে তা **পরিষ্কার করতে হবে**।**সারিতে ভালোভাবে মাটি উঁচু** করে দিতে হবে।**আলু গজানোর সাথে সাথে (২০-২৫ দিন বয়স হতে) নিয়মিতভাবে ভাইরাস আক্রান্ত গাছ রোগিং** অর্থাৎ **আলুসহ তুলে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে**।**জাব পোকা দমনে ইমিডাক্লোরোপিড গোত্রের কীটনাশক** যেমন- **এডমায়ার (০.৫ মি.লি./লিটার পানিতে)** অথবা **ম্যালাথিয়ন (২ মি.লি./লিটার পানিতে)** **১০-১৫ দিন পর পর জমিতে নিয়মিতভাবে স্প্রে** করতে হবে।**আলু গাছের বয়স ৮০ দিন হলে হামপুলিং (আলু গাছ শিকড়সহ তুলে ফেলা) করতে হবে** এবং এরপর **কমপক্ষে ৮-১০ দিন আলু জমিতে মাটির নিচে রেখে দিতে হবে**।

**আলুর পোকামাকড়**

**কাটুই পোকা** কাটুই পোকার কীড়া বেশ শক্তিশালী, **৪০-৫০ মিমি লম্বা**। পোকার **উপর পিঠ কালচে বাদামী বর্ণের**, পার্শ্বদেশ **কালো রেখাযুক্ত** এবং বর্ণ **ধূসর সবুজ**। শরীর **নরম ও তৈলাক্ত**। এই পোকার কীড়া **দিনের বেলা মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে** এবং **রাতের বেলা চারা গাছ কেটে দেয়**। এই পোকা **আলুতে ছিদ্র করে আলু ফসলের ক্ষতি করে**।

**প্রতিকার:**

* **আক্রান্ত কাটা আলু গাছ দেখে তার কাছাকাছি মাটি উল্টে পাল্টে কীড়া খুঁজে সংগ্রহ করে মেরে ফেলা উচিত**।
* **কাটুই পোকার উপদ্রব খুব বেশি হলে সেক্স ফেরোমন ট্রাপ + ফুরাডান ৫জি (কার্বোফুরান) @ ২০ কেজি/হেক্টর জমি তৈরির সময় এবং শেষ সেচের পূর্বে প্রয়োগ করে এই পোকার আক্রমণ কমানো সম্ভব**।
* **প্রতি লিটার পানির সাথে ক্লোরোপাইরিফস ২০ ইসি জাতীয় কীটনাশক (ক্লোরোপাইরিফস) ৫ মিলি হারে মিশিয়ে গাছের গোড়া ও মাটিতে স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে**।
* **আলু লাগানোর ৩০-৪০ দিন পর স্প্রে করতে হবে**।
* **কাটুই পোকার কীড়া দমনের জন্য বিষটোপ ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যায়**।
* **১ কেজি ধানের কুড়া এবং ক্লোরোপাইরিফস ৫ এমএল মিশিয়ে বিষটোপ তৈরি করা হয়**।

**আলুর সুতলী পোকা** আলুর সুতলী পোকার **মথ আকারে ছোট, ঝালরযুক্ত ও সরু ডানা বিশিষ্ট ধূসর বাদমী বর্ণের**। পূর্ণাঙ্গ কীড়া **সাদাটে বা হাল্কা গোলাপী বর্ণের** এবং **১৫-২০ মিমি লম্বা** হয়ে থাকে। কীড়া **আলুর মধ্যে লম্বা সুড়ঙ্গ করে আলুর ক্ষতি করে**। বাংলাদেশে **বসতবাড়িতে সংরক্ষিত আলু এ পোকার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়**।

**প্রতিকার:** **জমিতে সুতলী পোকা দমন ব্যবস্থাপনা:**

**আলুর জমিকে সর্বদা আবর্জনামুক্ত রাখতে হবে**।**আলুর সুতলী পোকা দমনে সেক্স ফেরোমন ট্রাপ এর সাথে মাটি উঠানোর মাধ্যমে এই পোকা দমন করা যায়**।**সেক্স ফেরোমন ট্রাপ + মাটি উঠানো (সর্বশেষ মাটি উঠানো অবশ্যই আলু সংগ্রহের কমপক্ষে ৬০ দিন পূর্বে করতে হবে)**।**মাঠ থেকে তোলার পর আলু উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা যাবে না**।**কারণ স্ত্রী মথ রাত্রি বেলায় উন্মুক্ত আলুর গায়ে ডিম পাড়ে**।**তাই মাঠ থেকে আলু তোলার পর মশারি অথবা পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে**।

**বসতবাড়িতে সংরক্ষিত আলুর সুতলী পোকা দমন ব্যবস্থাপনা:**

* **আলু সংরক্ষণ করার আগে সুতলী পোকা আক্রান্ত আলু বেছে ফেলে দিতে হবে**।
* **আলুর সুতলী পোকা দমনে সেক্স ফেরোমন ট্রাপ এর সাথে শুকনো বালি এবং নীম ওয়েল কেক (বালি এবং নীম ওয়েল কেক মিশ্রিত স্তর ০.৫ সেমি) এর ব্যবহার**।
* **সেক্স ফেরোমন ট্রাপ + শুকনো বালির পাতলা স্তর + নীম ওয়েল কেক @ ৩:১**।

**বাড়িতে সংরক্ষিত আলু শুকনা বালি, ছাই, তুষ অথবা কাঠের গুঁড়ার একটি পাতলা স্তর (আলুর উপরে ০.৫ সেমি) দিয়ে ঢেকে দিতে হবে**।

মিষ্টি আলু:

বাংলাদেশে মিষ্টি আলু আজও অবহেলিত, তাই একে গরীবের ফসল বলা হয়। কিন্তু এর পুষ্টিমান বিবেচনা করে বর্তমানে কেউ আর এটাকে অবহেলিত বা গরীবের ফসল বলছেন না। কারণ, এতে প্রচুর পরিমাণে শর্করা, খনিজ ও ভিটামিন আছে। এটি বিশ্বের অন্যতম শর্করা সমৃদ্ধ ফসল।

এক একক জমি থেকে মিষ্টি আলু যে পরিমাণ শর্করা উৎপন্ন করে তা অন্যান্য ফসল থেকে অনেক বেশি। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ আছে। এই ভিটামিন-এ এর অভাবে আমাদের দেশে প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) শিশু রাতকানা রোগে ভোগে এবং আস্তে আস্তে অনেকে অন্ধত্ব বরণ করে।

এক পরীক্ষায় দেখা গেছে, রঙিন শাঁসযুক্ত ১২৫ গ্রাম মিষ্টি আলু প্রতিদিন খেলে একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের ভিটামিন-এ চাহিদা পূরণ হয়।

মিষ্টি আলুতে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (GI) অনেক কম থাকার কারণে ডায়াবেটিস রোগীরাও সহজে খেতে পারেন। কাঁচা মিষ্টি আলুর GI মান ৪১, ৩০ মিনিট সিদ্ধ করার পর এর GI মান দাঁড়ায় ৪৪-৪৬, যা ৫৫ এর নিচে। যে সকল খাবারের GI মান ৫৫ এর নিচে, সেগুলো ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য মোটামুটি নিরাপদ।

মিষ্টি আলুর ভিটামিন বি৬ রক্তনালীকে স্বাভাবিক রেখে হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ করে।

বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই মিষ্টি আলুর চাষ হয়। এ ফসলের স্থানীয় জাতগুলো গুণে মানে ও ফলনে উৎকৃষ্ট নয়।

স্থানীয় জাতগুলোর গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ১০ টনের কম, কিন্তু উচ্চ ফলনশীল মিষ্টি আলুর জাতের ফলন প্রায় ৩০-৪০ টন/হেক্টর।

প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে উৎকৃষ্টমানের হালুয়া, চিপস, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি মিষ্টি আলু থেকে তৈরি করা যায়।

কৃষি ডায়েরি ২০১৯ অনুযায়ী, ২০১৭-১৮ সালে বাংলাদেশে মিষ্টি আলুর আওতাধীন জমির পরিমাণ প্রায় ৩৭ হাজার হেক্টর এবং বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৬.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দীর্ঘদিন যাবৎ এ ফসলের উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছে।

দীর্ঘ গবেষণার পর এ পর্যন্ত ১৬টি উচ্চ ফলনশীল ও গুণাগুণ সমৃদ্ধ মিষ্টি আলুর জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

জাতগুলো হলো: বারি মিষ্টি আলু-১ (তৃপ্তি), বারি মিষ্টি আলু-২ (কমলাপুরী), বারি মিষ্টি আলু-৩ (দৌলতপুরী), বারি মিষ্টি আলু-৪, বারি মিষ্টি আলু-৫, বারি মিষ্টি আলু-৬, বারি মিষ্টি আলু-৭, বারি মিষ্টি আলু-৮, বারি মিষ্টি আলু-৯, বারি মিষ্টি আলু-১০, বারি মিষ্টি আলু-১১, বারি মিষ্টি আলু-১২, বারি মিষ্টি আলু-১৩, বারি মিষ্টি আলু-১৪, বারি মিষ্টি আলু-১৫ ও বারি মিষ্টি আলু-১৬।

নিম্নে উদ্ভাবিত লাগসই ও সম্ভাবনাময় জাতসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা হলো:

বারি মিষ্টি আলু-২ (কমলা সুন্দরী) ১৯৮০ সালে এশীয় সবজি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, তাইওয়ান থেকে লাইনটি এনে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উপযোগিতা যাচাই করে ১৯৮৫ সালে জাতটি কমলা সুন্দরী নামে অনুমোদিত হয়।

এ জাতের কাণ্ড সবুজ, পাতা কচি অবস্থায় বেগুনি, কাণ্ডের অগ্রভাগ বেগুনি ও পাতা সবুজ।কন্দমূল লাল, শাঁস কমলা বর্ণের।কন্দমূলের আকৃতি উপবৃত্তাকার হয়।কন্দমূলের ওজন ১৮০-২২০ গ্রাম, শাঁস নরম।প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে প্রায় ৭,৫০০ আ.ইউ. ভিটামিন-এ আছে।এ জাতের কাণ্ডের অগ্রভাগ বেগুনি ও পাতার উল্টো দিকের শিরা বর্ণহীন।জীবনকাল ১৩৫-১৪০ দিন।উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ৪০-৪৫ টন ফলন হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ আলুর চাষ করা যায়।

বারি মিষ্টি আলু-৪ কমলা সুন্দরী, তৃপ্তি, দৌলতপুরী ও এস পি-০২৯ এর সাথে উন্মুক্ত পরাগায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত ক্লোন থেকে বাছাই করে জাতটি বারি মিষ্টি আলু-৪ নামে ১৯৯৪ সালে অনুমোদন লাভ করে।কন্দমূল ও শাঁস ঘি বর্ণের।কন্দমূলের ওজন ১৭৫-১৯৫ গ্রাম ও আকৃতি উপবৃত্তাকার।প্রতি গ্রাম শাঁসে প্রায় ১০৫০ আ.ইউ. ভিটামিন-এ আছে।জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন।উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন হয় ৪০-৪৫ টন।উইভিলের আক্রমণ কম হয়।

বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই বিশেষ করে যশোর ও খুলনায় এ জাতটি আগাম চাষ করা যায়।

বারি মিষ্টি আলু-৫ কমলা সুন্দরী, তৃপ্তি, দৌলতপুরী ও এস পি-০২৯ এর সাথে উন্মুক্ত পরাগায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত ক্লোন থেকে বাছাই করে জাতটি বারি মিষ্টি আলু-৫ নামে ১৯৯৪ সালে অনুমোদন লাভ করে।কন্দমূল লম্বাটে উপবৃত্তাকার, বর্ণ ঘিয়ে, শাঁস হলুদাভ।কন্দমূলের ওজন ১৮০-২২০ গ্রাম।প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে প্রায় ১০০০ আ.ইউ. ভিটামিন-এ আছে।জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন।উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন হয় ৩৫-৪৪ টন।উইভিলের আক্রমণ কম হয়।বিশেষ করে যশোর ও খুলনায় এ জাতটি আগাম চাষ করা যায়।বারি মিষ্টি আলু-৮ আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০০২ সালে কয়েকটি মিষ্টি আলুর লাইন সংগ্রহ করা হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর সিআইপি-৪৪০০২৫ লাইনটি খুবই প্রতিশ্রুতিশীল প্রতীয়মান হওয়ায় ২০০৮ সালে উক্ত লাইনটি বারি মিষ্টি আলু-৮ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।এ জাতের লতা ও পাতার বর্ণ সবুজ।কন্দমূলের চামড়ার বর্ণ লাল, শাঁসের বর্ণ হলুদ।কন্দমূলের গড় ওজন ১৬০ গ্রাম।শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ শতকরা ৩৫.৩ ভাগ।প্রতি ১০০ গ্রামে ৬৫০ আ.ইউ ভিটামিন-এ রয়েছে।জীবনকাল ১২০-১৩৫ দিন।উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ৪০-৪৫ টন ফলন পাওয়া যায়।বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ জাতের চাষ করা যায়।এ জাতটি খরা সহিষ্ণু।এ জাতে উইভিলের আক্রমণ কম হয়।

বারি মিষ্টি আলু-১১: বারি মিষ্টি আলু-৭, সিআইপি-৪৪০০২৫ এবং সিআইপি-৪৪০০৭৫-২ এর সাথে ২০০৬ সালে উন্মুক্ত পরাগায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত ক্লোন এসপি-৬১৩ কে বাছাই করে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর এ জাতটি বারি মিষ্টি আলু-১১ নামে ২০১৩ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

লতার কাণ্ড বেগুনি ও পাতা সবুজ। কন্দমূলের চামড়া লাল ও শাঁস হালকা হলুদ। কন্দমূলের গড় ওজন ১৮০-২০০ গ্রাম। শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ৩৫.৪৪%। ভিটামিন-এ ৫০০ আ.এ/১০০ গ্রাম। জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন। সাধারণ অবস্থায় এর ফলন হেক্টরপ্রতি প্রায় ৩৫-৪০ টন। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ জাতের চাষ করা যায়। জাতটিতে উইভিলের আক্রমণ কম হয়।

বারি মিষ্টি আলু-১২: আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০০৬ সালে কয়েকটি মিষ্টি আলুর লাইন সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর সিআইপি-৪৪০০০১ লাইনটি খুবই প্রতিশ্রুতিশীল প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত লাইনটি বারি মিষ্টি আলু-১২ নামে ২০১৩ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

লতার কাণ্ড ও পাতা সবুজ। কন্দমূলের চামড়া হলুদ ও শাঁস কমলা রঙের। কন্দমূলের গড় ওজন ১৬০-১৮০ গ্রাম। শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ২৯.৪৬%। ভিটামিন-এ ৫৮০০ আ.এ/১০০ গ্রাম। সাধারণ অবস্থায় এর ফলন হেক্টরপ্রতি প্রায় ৩৫-৪০ টন। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ জাতের চাষ করা যায়। জাতটিতে উইভিলের আক্রমণ কম হয়।

বারি মিষ্টি আলু-১৩: আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০০৬ সালে কয়েকটি মিষ্টি আলুর লাইন সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর সিআইপি-৪৪০০১৪ লাইনটি খুবই প্রতিশ্রুতিশীল প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত লাইনটি বারি মিষ্টি আলু-১৩ নামে ২০১৩ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

লতার কাণ্ড ও পাতা সবুজ এবং খাঁজকাটা। কন্দমূলের চামড়া গাঢ় হলুদ ও শাঁস কমলা রঙের। কন্দমূলের গড় ওজন ১৬০-১৮০ গ্রাম। শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ২৮.৯৩%। ভিটামিন-এ ১৩,২০০ আ.এ/১০০ গ্রাম। সাধারণ অবস্থায় এর ফলন হেক্টরপ্রতি প্রায় ৩৫-৪০ টন। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ জাতের চাষ করা যায়। জাতটিতে উইভিলের আক্রমণ কম হয়।

বারি মিষ্টি আলু-১৪ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্র হতে কিছু উন্নত লাইন পাওয়া যায়, যা কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র হতে মূল্যায়িত হয়েছে। এর মধ্যে **বারি মিষ্টি আলু-১৪ (CIP-441132)** জাতটি খুবই প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

জাতটির উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ ও চাষাবাদ পদ্ধতি সংক্ষেপে দেওয়া হলো—কাণ্ড মধ্যম পুরু এবং সবুজ বর্ণের।পাতা খাঁজকাটা, মধ্য শিরা পর্যন্ত পৌঁছায়।কচি ও বয়স্ক পাতার বর্ণ সবুজ, কিন্তু কিনারা বেগুনি।পাতার উল্টো দিকের শিরা বেগুনি রঙের।কাণ্ডের অগ্রভাগ কিছুটা রোমশ।কন্দমূল লম্বাটে ও অনিয়মিত।কন্দমূলের রঙ হালকা গোলাপি ও শাঁস কমলা রঙের।শাঁসের শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২৪.১২%আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত কালার চার্ট অনুযায়ী প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণ ৪.৯২ মিলিগ্রাম (আনুমানিক)।

বারি মিষ্টি আলু-১৫ **বারি মিষ্টি আলু-১৫ (CIP-440267.2)** জাতটি খুবই প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

জাতটির উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ ও চাষাবাদ পদ্ধতি সংক্ষেপে দেওয়া হলো—কাণ্ড মধ্যম পুরু এবং সবুজ রঙের।পাতা খাঁজকাটা নয়।কচি ও বয়স্ক পাতার রঙ সবুজ।পাতার উল্টো দিকের শিরা বেগুনি রঙের।কাণ্ডের অগ্রভাগ কিছুটা রোমশ।কন্দমূল লম্বাটে ও অনিয়মিত।কন্দমূলের রঙ হালকা গোলাপি ও শাঁস কমলা রঙের।শাঁসের শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২২.৩৯%।আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত কালার চার্ট অনুযায়ী প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণ ৪.৪১ মিলিগ্রাম (আনুমানিক)।

বারি মিষ্টি আলু-১৬ বৈশিষ্ট্য—

কাণ্ড মধ্যম পুরু এবং সবুজ রঙের।পাতা খাঁজকাটা নয়।কচি ও বয়স্ক পাতার রঙ সবুজ।কন্দমূল উপবৃত্তাকার।কন্দমূলের রঙ হালকা গোলাপি ও শাঁস কমলা রঙের।শাঁসের শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২৮.৯৭%আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত কালার চার্ট অনুযায়ী প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণ ১.১৫ মিলিগ্রাম (আনুমানিক)।

মিষ্টি আলু **উৎপাদন প্রযুক্তি:**

**জমি নির্বাচন ও তার প্রস্তুতি:** সুনিষ্কাশিত, উঁচু ও রৌদ্রজ্জ্বল জমি মিষ্টি আলু চাষের জন্য নির্বাচন করা প্রয়োজন। বেলে দোআঁশ মাটি উত্তম, তবে ভালো ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সব ধরনের মাটিতে মিষ্টি আলুর চাষ করা যায়। মাটির অম্লতা (pH) **৫.৬ থেকে ৬.০** হলে ভালো। মিষ্টি আলুর জন্য **মাটির উপরের ৩০ সেমি পর্যন্ত গভীর করে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করা প্রয়োজন**। এঁটেল মাটিতে চাষ করলে **কন্দ চিকন, লম্বা বা অনিয়মিত আকারের হয়**, ফলে **বাজার মূল্য কমে যায়**।

**বংশবিস্তারের জন্য লতা প্রস্তুতি:** মিষ্টি আলু সাধারণত **লতার কাটিং এর মাধ্যমে বংশবিস্তার** করা হয়। **রোগ জীবাণুমুক্ত, সুস্থ, সবল, পরিপক্ক লতা** হতে কাটিং প্রস্তুত করা হয়। লতার কাটিং এর দৈর্ঘ্য **২৫-৩০ সেমি (প্রায় ১ ফুট)** হওয়া উচিত, যাতে **২-৩টি পর্ব** বিদ্যমান থাকে। মিষ্টি আলুর **লতার প্রথম কাটিং সর্বোত্তম ও ফলন বেশি দেয়**।

**রোপণের সময়:** **অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত (কার্তিক থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ)** মিষ্টি আলুর লতা রোপণ করা যায়।

**রোপণ পদ্ধতি ও চারার সংখ্যা:** মিষ্টি আলুর **লতার কাটিং সমতল বেডে বা উঁচু ভেলি পদ্ধতিতে** রোপণ করা যায়। তবে **উঁচু ভেলি পদ্ধতিতে ফলন বেশি হয়**। সাধারণত **চরাঞ্চলে এবং সেচবিহীনভাবে চাষ করলে সমতল জমিতে ফারো করে লতার কাটিং লাগানো হয়**। সারি থেকে সারির দূরত্ব **৬০ সেমি (২ ফুট)** এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব **৩০ সেমি (১ ফুট)**। লতার অগ্রভাগ **মাটির উপরে রেখে দুই থেকে তিনটি পর্ব সমান্তরালভাবে মাটির ৪ থেকে ৮ সেমি নিচে পুঁতে দিতে হবে**। এ পদ্ধতিতে রোপণ করলে **প্রতি হেক্টর জমির জন্য প্রায় ৫৬ হাজার লতার প্রয়োজন হয়**। জমিতে **পর্যাপ্ত রস না থাকলে লতা লাগানোর পর পরই সেচ দিতে হবে** এবং **চারা ভালোভাবে না লাগা পর্যন্ত প্রয়োজনানুসারে ১-২ দিন পর পর সেচ দেওয়া উচিত**।

**সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি:** কৃষক ভাইয়েরা **মিষ্টি আলুতে সাধারণত সার দিতে চান না**। তবে **সর্বোচ্চ ফলনের জন্য সুষম সার সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক**। সারের পরিমাণ নির্ভর করে **মাটির প্রকৃতি, ফসলের জাত, সেচ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর**।

**সারের পরিমাণ (হেক্টরপ্রতি):**

* **ইউরিয়া:** ২৫০-২৮০ কেজি
* **টিএসপি:** ১৪০-১৭০ কেজি
* **এমওপি:** ২৩০-২৬০ কেজি
* **জিপসাম:** ৬০-৮০ কেজি
* **জিংক সালফেট:** ১০-১২ কেজি
* **ম্যাগনেসিয়াম সালফেট:** ৯০-১২০ কেজি
* **বরিক এসিড:** ৬-৮ কেজি
* **গোবর:** ১০,০০০ কেজি

**সার প্রয়োগ পদ্ধতি:** সম্পূর্ণ **গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট ও বরিক এসিড** এবং **অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার** **শেষ চাষের সময়** জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বাকি **অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি** **রোপণের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে** সারির পার্শ্বে (সারি থেকে উভয় দিকে ১০ সেমি দূরে) **ফারো তৈরি করে প্রয়োগ করা উত্তম**। সারের **উপরি প্রয়োগের পর পরই গাছের গোড়ায় অল্প পরিমাণে মাটি উঠিয়ে দিয়ে সেচ দেওয়া প্রয়োজন**। চরাঞ্চলে বা **সেচবিহীনভাবে চাষ করলে** উপরোক্ত **রাসায়নিক সার শতকরা ১০-১২ ভাগ কমিয়ে** একসঙ্গে **জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে প্রয়োগ করতে হবে**।

**পানি সেচ ও নিষ্কাশন:** মিষ্টি আলুর গাছ **মাটিতে লেগে গেলে ৩০ দিন, ৬০ দিন ও ৯০ দিন পর ৩ বার সেচ দেওয়া উচিত**। **অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে পানি নিষ্কাশনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে**। **সময়মতো পানি সেচ মিষ্টি আলুর ফলন এবং বাজারজাতকরণের উপযোগী কন্দমূলের সংখ্যা, ওজন ও গুণাগুণ বৃদ্ধি করে**।

**আগাছা ব্যবস্থাপনা:** মিষ্টি আলু **দ্রুত বর্ধনশীল ফসল** এবং এটি **দ্রুত মাটিকে ঢেকে ফেলে ও আগাছাকে অবদমিত করে**। তবুও **গাছের বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে আগাছা দমন করা জরুরি**। ভালো ফলনের জন্য **চারা রোপণের পর এবং সারির উপরি প্রয়োগের আগে কমপক্ষে একবার আগাছা দমন করা অত্যাবশ্যক**।

**লতা নাড়ানো:** **চারা রোপণের ৫০-৬০ দিন পর থেকে মাসে অন্তত একবার লতা নেড়ে চেড়ে দিতে হবে**। এতে **মিষ্টি আলুর পর্ব থেকে শিকড় গজানো তথা বাজারজাত অনুপযোগী কন্দমূল উৎপাদন এড়ানো সম্ভব হয়** এবং **ফলশ্রুতিতে কন্দের আকার ও ফলন বৃদ্ধি পায়**।

**পোকা ও দমন ব্যবস্থাপনা:** **মিষ্টি আলুর উইভিল বিশ্বব্যাপী পরিচিত একটি ক্ষতিকর পোকা**।

উৎপাদন প্রযুক্তি ও দমন ব্যবস্থাপনা

* পোকার আক্রমণমুক্ত সুস্থ, সবল মিষ্টি আলুর লতা বা কাণ্ডের অগ্রভাগ (৩০ সেমি) জমিতে লাগানো উচিত।
* মিষ্টি আলুর লতা এডমায়ার দ্রবণে (০.৫ মিলিলিটার/লিটার পানি) ২০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে পরে রোপণ করতে হবে।
* ফেরোমোন ফাঁদ পেতে পুরুষ উইভিল মেরে ফেলা সম্ভব। এতে করে নতুন উইভিলের জন্ম হতে পারে না এবং আস্তে আস্তে উইভিলের সংখ্যা কমে যাবে।
* গাছের গোড়ায় সময়মতো মাটি উঠিয়ে দিতে হবে।
* উইভিল আক্রান্ত লতা ও কন্দমূল পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা গর্ত করে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে।
* হেক্টরপ্রতি ১৫ কেজি হারে ডায়াজিনন ১৪জি/কারবোফুরান ৫জি প্রয়োগ করে হাল্কা সেচ দিতে হবে।

**কন্দমূল উত্তোলন ও ফলন:**

* চারা রোপণের ১২০ থেকে ১৪০ দিন পর কন্দমূল উত্তোলন উপযোগী হয়, তবে ১৬০ দিনের বেশি রাখলে শাঁস আঁশযুক্ত হয়।
* মাটির সাধারণ ‘জো’ অবস্থায় কোদাল দ্বারা কুপিয়ে মিষ্টি আলু উত্তোলন করা হয়।
* উত্তম ব্যবস্থাপনায় উচ্চফলনশীল মিষ্টি আলুর জাতগুলোর ফলন ৩৫-৪০ টন/হেক্টর হয়ে থাকে।

**মিষ্টি আলু সংরক্ষণ:**

* মিষ্টি আলুর সংরক্ষণ গুণ খুব একটা আশাপ্রদ নয়।
* বাংলাদেশে মিষ্টি আলু সংগ্রহকালীন সময় মার্চ-এপ্রিল মাসে (মধ্য ফাল্গুন থেকে মধ্য বৈশাখ) তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, ফলে উইভিলের আক্রমণ বৃদ্ধি পায় এবং কন্দমূল সহজেই নষ্ট হয়।

**সংরক্ষণের পূর্বে কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা:**

1. মিষ্টি আলু সংগ্রহের সময় মাটি সাধারণ ‘জো’ অবস্থায় অর্থাৎ মাটি যেন কাদাময় না থাকে।
2. ফসল সংগ্রহের পূর্বে লতা টান দিয়ে না ছিঁড়ে কাঁচি দ্বারা কেটে আলাদা করতে হবে।
3. সংগ্রহের পর মিষ্টি আলু ৭-১০ দিন ছায়ায় ছড়িয়ে রেখে কিউরিং করে নিতে হবে।
4. রোগাক্রান্ত, কাটা বা থেতলানো এবং উইভিল আক্রান্ত মিষ্টি আলু দ্রুত বাছাই করে আলাদা করতে হবে।
5. কন্দমূলের ত্বক যাতে আঘাতপ্রাপ্ত না হয়, সেজন্য ফসল সংগ্রহ থেকে সংরক্ষণ পর্যন্ত সকল কার্যক্রম সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

এরপর কিউরিংকৃত বাছাই করা নিখুঁত মিষ্টি আলু উত্তম বায়ু চলাচলযুক্ত ঘরে শুকনা বালি বিছিয়ে তার উপর একস্তর মিষ্টি আলু (৭৫ সেমি) আবার বালুর স্তর (১০ সেমি) এভাবে ৫-৬টি স্তরে সংরক্ষণ করা হয়। বায়ু চলাচলযুক্ত ঘর যেখানে তাপমাত্রা **১৬-১৮°C** থাকে, সেখানে **মিষ্টি আলু ৫-৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়**।

**ব্যবহার:** রূপান্তরিত কন্দমূল এবং লতার কচি ডগা মানুষের ভক্ষণযোগ্য অংশ। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় **মিষ্টি আলুর কচি ডগা সবজি হিসেবে খাওয়া হয়**। এটি একটি উপাদেয় ও **পুষ্টিকর সবজি**। **মিষ্টি আলুর কন্দ সাধারণত পুড়িয়ে বা সিদ্ধ করে খাওয়া হয়**। **মিষ্টি আলুর পেকটিন হতে জ্যাম, জেলি ও মারমালেট প্রস্তুত করা যায়**। এছাড়া **স্টার্চ, শর্করা, সিরাপ, অ্যালকোহল এবং বেকিং ও কনফেকশনারি শিল্পে এটির বহুল ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে**। **উন্নত মানের চিপস ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরি করা সম্ভব**। **অপরিণত কন্দমূল এবং লতা গোখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়**। **কমলা রঙের মিষ্টি আলু সিদ্ধ করলে কিছুটা নরম হয়**। **সিদ্ধ মিষ্টি আলু দুধের সাথে মিশিয়ে বা পায়েশ তৈরি করে খাওয়ানো যায়**। **মিষ্টি আলু টুকরা টুকরা করে খিচুড়ি রান্না করে বা ময়দার সাথে মিশিয়ে রুটি তৈরি করেও শিশুদের খাওয়ানো সম্ভব**।

সুতরাং **ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ মিষ্টি আলু আমাদের ভিটামিন-এ চাহিদা পূরণে এবং এর বহুমুখী ব্যবহার কৃষি অর্থনীতিতে বৈচিত্র্যময় ভূমিকা রাখতে পারে**।

**মিষ্টি আলুর অন্যান্য পরিচর্যা**

**মিষ্টি আলুর উইভিল পোকা** পূর্ণ বয়স্ক উইভিল প্রায় **৬ মিমি লম্বা এবং ১.৪ মিমি চওড়া** হয়ে থাকে। এ পোকার **মাথার শুঁড়ের মতো একটি মুখাংশ** আছে। মাথা এবং শাখার উপরিভাগ **গাঢ় নীল রঙের**, চোখ ও পা **উজ্জ্বল লাল-কমলা বর্ণের**। কীড়া **কন্দমূলের ভিতরে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ করে ক্ষতি করে**। উইভিল আক্রান্ত **কন্দমূল খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে**।

**প্রতিকার:**

* **মিষ্টি আলুর লতা বা কাণ্ডের অগ্রভাগ (৩০ সেমি) জমিতে লাগানো উচিত**।
* **লতার অগ্রভাগে সাধারণত মিষ্টি আলুর উইভিলের ডিম থাকে না**।
* **মিষ্টি আলুর উইভিল পোকা দমনে সেক্স ফেরোমন ট্রাপ এর সাথে মাটি উঠানো এবং কার্বোফুরান ৫ জি প্রয়োগের মাধ্যমে এই পোকা দমন করা যায়**।
* **সেক্স ফেরোমন ট্রাপ + মাটি উঠানো (মাটি উঠানো কমপক্ষে তিন বার-৩০, ৬০, ৯০ দিনে করতে হবে) + কার্বোফুরান ৫ জি (মিষ্টি আলুর লতা লাগানোর ৬০ দিন পর প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে)**।
* **মিষ্টি আলু সংরক্ষণের সময় উইভিল আক্রমণমুক্ত কন্দমূল শুকনা বালি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে**।
* **মেঝেতে প্রথমে ১০ সেমি পুরু একটি শুকনা বালির স্তর সাজানো যেতে পারে**।
* **এরপর ৭৫ সেমি পুরু পর্যন্ত মিষ্টি আলুর স্তর সাজাতে হবে**।
* **মিষ্টি আলুর উপরে আবার ১০ সেমি পুরু বালির স্তর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে**।

**মিষ্টি আলুর বিভিন্ন রোগ ও তার দমন ব্যবস্থাপনা**

**নরম পচা রোগ (Rhizopus Rot)** এ রোগটি **রাইজোপাস রট** নামেও পরিচিত। এটি **প্রধানত সংরক্ষিত মিষ্টি আলুতে দেখা যায়** এবং **সবচেয়ে মারাত্মক রোগ**।

**রোগের কারণ:** **Rhizopus nigricans** নামক **এক ধরনের ছত্রাক দ্বারা এ রোগটি হয়ে থাকে**।

**রোগের লক্ষণ:**

* **আক্রান্ত আলু, দুপ্রান্ত হতে দ্রুত নরম ও আর্দ্র হয়ে পচে যায় যা গাজনের গন্ধ ছড়ায়**।
* **আক্রান্ত আলুর উপরিভাগে মাইসেলিয়ামের পুরু স্তর দেখা যায়**।
* **প্যাথোজেনের কালো বর্ণের ফ্রুটিং বডিও দেখা যায়**।

**রোগ দমন ব্যবস্থাপনা:**

* **জমি হতে টিউবার উত্তোলন, পরিবহন, সংরক্ষণ প্রভৃতির সময়ে খেয়াল রাখতে হবে যাতে টিউবার আঘাতপ্রাপ্ত না হয়**।
* **সংরক্ষণের পূর্বে টিউবার ভালোভাবে কিউরিং করতে হবে**।
* **এ রোগ কমানোর জন্য কাটা, ছেড়া, থেতলানো টিউবার বেছে শুধু নিখুঁত টিউবার সংরক্ষণ করতে হবে**।

**কালচে রোগ বা বাক রট/চারকোল রট (Charcoal Rot)** এ রোগটি **প্রধানত সংরক্ষিত মিষ্টি আলুতে দেখা যায়**।

**রোগের কারণ:** **Macrophomina phaseolina / Diplodia natalensis** নামক **ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে**।

**রোগের লক্ষণ:**

* **এ রোগের আক্রমণে আক্রান্ত গাছ ধীরে ধীরে কালো হয়ে যায়**।
* **গুদামজাত অবস্থায় টিউবারেও এ রোগ দেখা যায়**।
* **টিউবারে এ রোগের আক্রমণে কালো দাগ পড়ে**।
* **পরবর্তীতে পচন শুরু হয়ে পুরো টিউবারটি পচে নষ্ট হয়ে যায়**।

**রোগ দমন ব্যবস্থাপনা:**

* **সংরক্ষিত টিউবারকে এ রোগের আক্রমণ হতে রক্ষা করতে সংরক্ষণের পূর্বে ভালোভাবে কিউরিং করতে হবে**।
* **এ রোগ কমানোর জন্য কাটা, ছেড়া, থেতলানো টিউবার বেছে শুধু নিখুঁত টিউবার সংরক্ষণ করতে হবে**।
* **ফসল উঠানোর পর প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি ডায়থেন এম-৪৫ অথবা রিডোমিল গোল্ড প্রয়োগ করে তা টিউবারে স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়**।

**মিষ্টি আলুর মাইল্ড মোটল, ক্লোরটিক ফ্লেক্স এবং লেটেন্ট ভাইরাস**

একাধিক ভাইরাস এ রোগের জন্য দায়ী। এ ভাইরাসটি **বাহক পোকার মাধ্যমে আক্রান্ত গাছ হতে সুস্থ গাছে ছড়িয়ে পড়ে**।**রোগের লক্ষণ:পাতায় হালকা মোজাইক বা হালকা হলুদ রঙ ধারণ করা**।**গাছ ছোট হয়ে যাওয়া এ সব ভাইরাসের মূল লক্ষণ**।**এ রোগের ফলে মিষ্টি আলুর ফলন কিছুটা হ্রাস পায়**।

**রোগ দমন ব্যবস্থাপনা:**

**রোগমুক্ত গাছ থেকে লতা সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে হবে**।**এ ভাইরাস রোগের বিস্তার রোধের জন্য এদের বাহক পোকা কীটনাশকের মাধ্যমে দমন করতে হবে**।

**সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন সংরক্ষণ মাধ্যমের দ্বারা মিষ্টি আলুর ফলন, গুণাগুণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ:হেক্টর প্রতি ৩ টন মুরগীর বিষ্ঠা অথবা ৬ টন গোবর এবং সুপারিশকৃত রাসায়নিক সারের চেয়ে কম পরিমাণ অজৈব সার (হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ২৭০, ৭৫, ২৪০ এবং ৫৫ কেজি ইউরিয়া, টি এসপি, পটাশ এবং জিপসাম) প্রয়োগ করলে ভালো ও মানসম্মত মিষ্টি আলু পাওয়া যাবে**।**৪৯ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করলে মিষ্টি আলুর গুণাগুণ বজায় থাকে**।**বিভিন্ন সংরক্ষণ মাধ্যমের মধ্যে বালুতে সংরক্ষণ করলে বেশিদিন আলু ভালো থাকে, বিশেষ করে আলুর রং, মিষ্টি এবং ফাইবারমান ভালো থাকে**।

**সতর্কতা:**

**জমি হতে মিষ্টি আলু উত্তোলন, পরিবহন, সংরক্ষণ প্রভৃতির সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে মিষ্টি আলু আঘাতপ্রাপ্ত না হয়**।**সংরক্ষণের জন্য কাটা, ছেড়া, থেতলানো মিষ্টি আলু বেছে শুধু নিখুঁত মিষ্টি আলু সংরক্ষণ করতে হবে**।**সকল মিষ্টি আলু জন্মানো এলাকা:** বিশেষ করে **জামালপুর, শেরপুর, বগুড়া, রংপুর, গাইবান্দা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, যশোর, কুষ্টিয়া, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, গাজীপুর** ইত্যাদি।**কচু** :বাংলাদেশে কচু একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সবজি। এ দেশে কচু জাতীয় সবজির মধ্যে **পানিকচু, মুখীকচু, ওলকচু, পঞ্চমুখী কচু, ঘটমান কচু, মানকচু, দুধকচু** ইত্যাদির চাষ হয়ে থাকে। কচুতে **ভিটামিন ‘এ’ এবং লৌহ প্রচুর পরিমাণে থাকে**। বাংলাদেশের **মাটি ও জলবায়ু কচু চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী**।

### **পানি কচু**

যে সমস্ত কচু **স্বল্প পানিতে চাষ করা যায়**, তাকে **পানি কচু** বলে। আমাদের দেশে **পানি কচু একটি সুস্বাদু সবজি হিসেবে পরিচিত**। পানি কচু দুই প্রকার— ১. **লতি উৎপাদী** ২. **কাণ্ড বা রাইজোম উৎপাদী**। বাংলাদেশে পানি কচুর **বিভিন্ন নাম রয়েছে**— **নারিকেল কচু, জাত কচু, বাঁশ কচু** ইত্যাদি। বাংলাদেশে প্রায় **২৩ হাজার হেক্টর জমিতে কচুর চাষ করে প্রায় ২ লক্ষাধিক টন ফলন পাওয়া যায়**। পানি কচু ও মুখীকচু এর মধ্যে **প্রায় ৮৫% জায়গা দখল করে আছে**।

### **পানি কচুর জাত**

#### **লতিরাজ (বারি পানি কচু-১)**

সারাদেশ থেকে সংগৃহীত **১০০টি পানি কচুর জার্মপ্লাজম থেকে উপযোগিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে** লতিরাজ জাতটি **১৯৮৮ সালে অনুমোদন করা হয়**। **লতিরাজ জাতের কাণ্ড অপেক্ষা লতির প্রাধান্য বেশি**। এর **গাছ মাঝারি, পাতা সবুজ**, পাতা ও বোঁটার সংযোগস্থলের **উপরিভাগ লাল রঙের**, যা **জাতটির শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**। **জীবনকাল ১৮০-২৭০ দিন**। লাগানোর **২ মাস পর থেকে ৭ মাস পর্যন্ত লতি হয়ে থাকে**। সাধারণ অবস্থায় **হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ টন লতি এবং প্রায় ১৫-২০ টন কাণ্ড উৎপন্ন হয়**। লতি **লম্বায় ৯০-১০০ সেমি, সামান্য চেপ্টা, হালকা গোলাপি রঙের**। লতি **সিদ্ধ করলে সমানভাবে সিদ্ধ হয় এবং গলা চুলকানিমুক্ত** অর্থাৎ **এ কচুতে ক্যালসিয়াম অক্সালেটের পরিমাণ কম থাকায় গলা চুলকায় না**। **বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই চাষ করা যায়**।

#### **বারি পানি কচু-২**

**দেশীয় জার্মপ্লাজম থেকে উপযোগিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে ২০০৮ সালে** এ জাতটি **অবমুক্ত করা হয়**। এ জাতের **সব অঙ্গই সবজি হিসেবে খাওয়া যায়**। যদিও **লতিই হলো এ জাতের প্রধান ভক্ষণযোগ্য অংশ**। এ জাতটি **প্রচুর উৎকৃষ্ট মানের লতি উৎপাদন করে**, যার **প্রতিটি লতি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ মিটার লম্বা হয়**। লতি **গোলাকার, অপেক্ষাকৃত মোটা ও গাঢ় সবুজ বর্ণের** হয় এবং **গলা চুলকানিমুক্ত**। **হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-৩০ টন লতি এবং প্রায় ১৮-২২ টন কাণ্ড উৎপন্ন হয়**।

#### **বারি পানি কচু-৩**

**দেশীয় জার্মপ্লাজম থেকে উপযোগিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে ২০০৮ সালে** জাতটি **অবমুক্ত করা হয়**। এ জাতেরও **সব অঙ্গই সবজি হিসেবে খাওয়া যায়**। তবে **কাণ্ড (রাইজোম) হলো এ জাতের প্রধান ভক্ষণযোগ্য অংশ**। **কাণ্ড গোলাকার, মোটা ও হালকা সবুজ বর্ণের**, যা **গলা চুলকানিমুক্ত**। **কাণ্ডের দৈর্ঘ্য প্রায় ১ মিটার লম্বা হয়**। **হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-৩০ টন কাণ্ড এবং প্রায় ১০-১২ টন লতি হয়**।

#### **বারি পানি কচু-৪**

**দেশীয় জার্মপ্লাজম থেকে উপযোগিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে ২০১৩ সালে** এ জাতটি **অবমুক্ত করা হয়েছে**। **গাছ খাড়া, কাণ্ড থামাকার এবং সবুজ বর্ণের**। **পাতা সবুজ ও হৃদপিণ্ডাকৃতির**। **কাণ্ড মোটা এবং গোলাপি রঙের**। **পত্রফলকের মধ্য ও অন্যান্য শিরা নিচের পৃষ্ঠে গাঢ় গোলাপি রঙের** এবং **উপরের পৃষ্ঠে গোলাপি রঙের**। **বোঁটা এবং বোঁটা ও পত্রফলকের সংযোগস্থল গোলাপি রঙের**। **রাইজোম গোলাপি রঙের এবং শাঁস হালকা গোলাপি**, যা **অন্য জাত থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ**। **হেক্টরপ্রতি ফলন ৩৫-৪৫ টন কাণ্ড এবং প্রায় ৫-৮ টন লতি উৎপন্ন হয়**।

#### **বারি পানি কচু-৫**

**দেশীয় জার্মপ্লাজম থেকে উপযোগিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে ২০১৩ সালে** এ জাতটি **অবমুক্ত করা হয়েছে**। **গাছ খাড়া, কাণ্ড থামাকার এবং সবুজ বর্ণের**। **পাতা সবুজ ও হৃদপিণ্ডাকৃতির**। **কাণ্ড মোটা এবং সবুজ রঙের**। **পত্রফলকের মধ্য ও অন্যান্য শিরা সবুজ রঙের**। **বোঁটা এবং বোঁটা ও পত্রফলকের সংযোগস্থল সবুজ রঙের**। **রাইজোম হালকা সবুজ রঙের এবং শাঁস সাদাটে**। **হেক্টরপ্রতি ফলন ৩৫-৪০ টন কাণ্ড এবং প্রায় ৫-৮ টন লতি উৎপন্ন হয়**।

#### **বারি পানি কচু-৬**

**গাছ খাড়া, কাণ্ড থামাকার এবং সবুজ বর্ণের**। **পাতা সবুজ ও তীরাকার**। **পাতার পত্রফলকের শিরার মাঝখানে কালো রঙের ছোপ ছোপ দাগ থাকে**। **পত্রফলকের মধ্য ও অন্যান্য শিরা সবুজ রঙের**। **পাতার উপরের ও নিচের দিকের শিরাগুলো ভাসা**। **কাণ্ড ১ মিটার লম্বা ও ব্যাস ৩০-৩৫ সেমি**। **হালকা সবুজ রঙের এবং শাঁস আকর্ষণীয় সাদা**। **গলা চুলকানিমুক্ত, সিদ্ধ করলে সমানভাবে সিদ্ধ হয়**।

**কচু** উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: পলি দোআঁশ ও এঁটেল মাটি পানি কচু চাষের উপযোগী।

রোপণের সময়: আগাম ফসলের জন্য কার্তিক (মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বর) ও নাবী ফসলের জন্য মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-বৈশাখ (মার্চ-এপ্রিল) মাসে লাগানো যায়। তবে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস (ডিসেম্বর থেকে মধ্য-জানুয়ারি) চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

রোপণ পদ্ধতি: কচু চাষে প্রয়োজন প্রতি হেক্টরে ৩৭-৩৮ হাজার চারা।

বীজ রোপণের দূরত্ব: উন্নত জাতের কচুর জমিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪৫ সেমি রাখতে হবে।

সারের পরিমাণ: গোবর ১০,০০০-১৫,০০০ কেজি/হেক্টর, ইউরিয়া ৩০০-৩৫০ কেজি/হেক্টর, টিএসপি ১৫০-২০০ কেজি/হেক্টর, এমওপি ২৫০-৩৫০ কেজি/হেক্টর, জিপসাম ১০০-১৩০ কেজি/হেক্টর, জিংক সালফেট ১০-১৬ কেজি/হেক্টর, বরিক এসিড ১০-১২ কেজি/হেক্টর।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট, বরিক এসিড এবং অর্ধেক এমওপি সার জমি তৈরির সময় শেষ চাষের আগে প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের ১.৫-২ মাস সময়ে অর্ধেক এমওপি এবং ইউরিয়ার এক ষষ্ঠাংশ ছিটিয়ে দিতে হবে। বাকি পাঁচ ভাগ ইউরিয়া সার সমান কিস্তিতে ১৫ দিন পর পর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: পানি কচুর গোড়ায় দাঁড়ানো পানির গভীরতা ৮-১০ সেমি এর বেশি হলে ফলন কমে যায় এবং দাঁড়ানো পানি মাঝে মাঝে নাড়িয়ে দিতে হবে। বর্ষাকালে জমি থেকে ৮-১০ সেমি এর বেশি পানি সরিয়ে ফেলতে হবে।

আগাছা দমন: পানি কচুর জমি সব সময়ই আগাছামুক্ত রাখতে হবে। চারা লাগানোর পর থেকে ৩ মাস পর্যন্ত জমিতে আগাছা জন্মাতে পারে। এ সময় জমি আগাছামুক্ত রাখা খুবই প্রয়োজন।

সেচ ও পানি নিষ্কাশন: পানি কচু জলজ উদ্ভিদ হলেও দীর্ঘ জলাবদ্ধতার জন্য ভালো নয়। এ জন্য মাঝে মাঝে দাঁড়ানো পানি নেড়ে চেড়ে দেওয়া আবশ্যক। পানি কচুর জন্য দাঁড়ানো পানির গভীরতা ৮-১০ সেমি এর বেশি হওয়া উচিত নয়।

অন্যান্য পরিচর্যা

পোকামাকড়, রোগবালাই এবং এর প্রতিকার পানি কচুতে কয়েকটি পোকা ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ হতে পারে। সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

পোকামাকড়

লেদা পোকা বা প্রডেনিয়া ক্যাটারপিলার পূর্ণবয়স্ক মথের পাখার বিস্তৃতি ২.৫ সেমি। পূর্ণবয়স্ক মথ গাছের পাতার নিচে গুচ্ছাকারে ডিম পাড়ে। কীড়া প্রাথমিক পর্যায়ে সবুজ বর্ণের হয় এবং মাথার রং কালো হয়। একটি পূর্ণবয়স্ক কীড়া ২.৫ সেমি লম্বা হয়। প্রাথমিকভাবে এরা গুচ্ছাকারে থাকলেও পরবর্তীতে সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রতিকার

* ডিম সংগ্রহ করে নষ্ট করা এবং হাত দ্বারা কীড়া আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করা।
* এই পোকার আক্রমণ বেশি হলে ট্রেসার ৪৫ এসসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৪ মি.লি. মিশিয়ে ২০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
* ফেরোমোন ফাঁদ পেতে পুরুষ পোকা মারা সম্ভব। এতে করে নতুন পোকার জন্ম হতে পারে না এবং আস্তে আস্তে পোকার সংখ্যা কমে যাবে।
* ফেরোমোন ফাঁদের সাথে বায়োপেস্টিসাইড প্রয়োগ করলে সহজে পোকা দমন করা যায়।
* আক্রমণ তীব্র হলে কুইনালফস গ্রুপের কীটনাশক (দেবীকুইন ২৫ইসি/কিনালাক্র ২৫ইসি/করোলাক্র ২৫ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি লিটার পরিমাণ মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

কচুর লাল মাকড় কচুর পাতার নিচের দিকে লাল রঙের ক্ষুদ্র মাকড়ের আক্রমণ দেখা যায়। এদেরকে খালি চোখে দেখা যায় না। পূর্ণবয়স্ক এবং নিম্ফ উভয়ই গাছের ক্ষতি করে থাকে।

প্রতিকার

* প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মি.লি. এবামেকটিন (ভার্টিমেক ১.৮ ইসি) পানির সাথে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর জমিতে প্রয়োগ করে লাল মাকড় দমন করা যায়।
* পাইরিথ্রয়েড জাতীয় কীটনাশক ব্যবহার যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। কারণ পাইরিথ্রয়েড জাতীয় কীটনাশক অতিরিক্ত ব্যবহারে জমিতে পরভোজী মাকড়ের সংখ্যা কমে যায় এবং ফলশ্রুতিতে ক্ষতিকারক মাকড়ের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়।

কচুর জাব পোকা জাব পোকা (Aphids) রস শোষণ করে এবং ভাইরাস রোগ ছড়িয়ে ফসলে ক্ষতি করে। এই পোকা পাতার রস শোষণ করে এবং ক্লোরোফিলের পরিমাণ হ্রাস করে। ফলে গাছের খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়, ফলশ্রুতিতে ফলনও কমে যায়।

প্রতিকার

* হাইডাফ্লোপ্রিড (এডমায়ার ১০০ এসপি) ০.৫ মি.লি. হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

কচুর বিভিন্ন রোগ ও তার দমন ব্যবস্থাপনা

কচু বাংলাদেশের একটি প্রধান সবজি। এতে প্রচুর পরিমাণ শ্বেতসার, ক্যালসিয়াম, লৌহ, ফসফরাস এবং ভিটামিন এ ও সি রয়েছে। এছাড়া এর স্টার্চ কণা ছোট বলে শিশু খাদ্য হিসেবে সহজেই ব্যবহার করা যায়। কচু সাধারণত খরিফ মৌসুমে চাষ করা হয়। এটি খরিফ মৌসুমের শতকরা প্রায় ২৬ ভাগ দখল করে থাকে। বর্ষার শেষ ভাগে বাজারে সবজির ঘাটতি দেখা যায়। এ সময় কচুই সবজির ঘাটতি অনেকটা পূরণ করে থাকে। বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া কচু চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। অন্যান্য ফসলের মতো কচুও নানা রোগবালাই দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে, যার ফলে এর ফলন হ্রাস পায়।

পাতা ঝলসানো রোগ

কচুর রোগের মধ্যে পাতা ঝলসানো রোগ অন্যতম। পৃথিবীতে এ রোগ **ট্যারো লিফ ব্লাইট (Taro Leaf Blight), ফাইটোফথোরা লিফ ব্লাইট (Phytophthora Leaf Blight)** ইত্যাদি নামে পরিচিত। ধারণা করা হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এ রোগ প্রথম দেখা দেয় যা পরবর্তীতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ ও ওশেনিয়া অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তবে আমাদের দেশে এ রোগ **কচুর পাতা ঝলসানো রোগ** নামে পরিচিত। আক্রান্ত বীজ ও আক্রান্ত গাছের অংশবিশেষ স্থানান্তরের মাধ্যমে এ রোগ, আক্রান্ত স্থান হতে রোগমুক্ত স্থানে বিস্তার লাভ করে। এ রোগের আক্রমণে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয়। এ রোগ ফসলের **পাতা, করম (Corm) ও অন্যান্য দেহতাত্ত্বিক অংশে হয়ে থাকে**। এ রোগের আক্রমণে **পাতা ও করম পচে যায়**। এক প্রতিবেদনে দেখা যায় **এ রোগের আক্রমণে মাঠে ৩০-৪০% পর্যন্ত ফলন হ্রাস পায়**। এমনকি সংরক্ষিত করমেও **এ রোগের আক্রমণে পচন দেখা যায়**। ফিলিপাইনে এক গবেষণায় দেখা যায়, **এ রোগের আক্রমণে সহনশীল জাতগুলোর ক্ষেত্রে ২৪.৪% এবং রোগপ্রবণ জাতগুলোর ক্ষেত্রে ৩৬.৫% ক্ষতি হয়**। উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা, **ঘন করে গাছ লাগানো** এ রোগের আক্রমণকে ত্বরান্বিত করে। অতিরিক্ত আর্দ্র আবহাওয়ায়, **আক্রান্ত পাতা বা কিউটিকলে প্রচুর পরিমাণে এ রোগের জীবাণু উৎপন্ন হয়** যা **বৃষ্টির মাধ্যমে পুরো জমিতে ছড়িয়ে পড়ে**। বাংলাদেশে **জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে** এ রোগের আক্রমণ বেশি দেখা যায়।

**রোগের জীবাণু:** **Phytophthora colocasiae** নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এ ছত্রাকটির **মাইসেলিয়াম বর্ণহীন, শাখাযুক্ত ও প্রস্থ প্রাচীরবিহীন**।

**রোগের লক্ষণ:**

* **আক্রান্ত পাতায় প্রথমে ছোট কালো দাগ দেখা যায় যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে হলুদ প্রান্তযুক্ত বাদামী রঙে পরিণত হয়**।
* **আক্রান্ত স্থানে চক্রাকার জোনের সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে হলুদ রঙের তরল বের হয়, যা পরবর্তীতে শুকিয়ে গাঢ় বেগুনি রঙ ধারণ করে**।
* **কিছু কিছু রোগাক্রান্ত অংশ সাদা রঙের স্পোরাঞ্জিয়া দ্বারা বেষ্টিত থাকে**।
* **পরবর্তীতে দাগগুলো বৃদ্ধি পায় এবং অনেকগুলো দাগ একত্রিত হয়ে (সাধারণত পাতার প্রান্ত বরাবর) পুরো পাতায় ছড়িয়ে যায়**।
* **আক্রান্ত পাতায় অনিয়মিত আকৃতির দাগ দেখা যায়**।
* **মাঝে মাঝে এ রোগের আক্রমণের ফলে পেটিউলে ছোপ ছোপ ভেজা দাগ দেখা যায়**।
* **পরবর্তীতে সম্পূর্ণ গাছ ও পাতা পুড়ে যায়**।
* **সংরক্ষিত করমে এ রোগের আক্রমণে ধূসর বাদামী থেকে কালচে নীল রঙের দাগ দেখা যায়**।
* **এ দাগগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে একত্রিত হয়ে সমস্ত করম পচে যায়**।

**রোগ দমন ব্যবস্থাপনা:**

* **এ রোগের অন্যতম উৎস হলো আক্রান্ত বীজ। তাই রোগমুক্ত এলাকা থেকে সুস্থ বীজ সংগ্রহ করতে হবে**।
* **গাছের রোগাক্রান্ত পাতা ছেটে ফেলা এবং ফসল সংগ্রহের পর জমিতে পড়ে থাকা করম ও পাতা ধ্বংস করতে হবে**।
* **জমিতে রোগ দেখা মাত্রই ছত্রাকনাশক যেমন- সিকিউর / ডাইথেন এম-৪৫ নামক ছত্রাকনাশক ২০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন অন্তর স্প্রে করলে এ রোগ দমন করা যায়**।

পাতায় দাগ পড়া বা লিফ স্পট রোগ এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। বাংলাদেশে কচুর জমিতে সাধারণত এ রোগ সহজেই চোখে পড়ে।

রোগের জীবাণু: কোলেটোট্রিকাম (Colletotrichum) গণের অন্তর্ভুক্ত **কোলেটোট্রিকাম ক্যাপসিসি (Colletotrichum capsici)** এবং **কোলেটোট্রিকাম লিন্ডেমুথিয়ানাম (Colletotrichum lindemuthianum)** নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ:

* এ রোগের আক্রমণে কচু পাতায় শুকনো ছোট ও মাঝারি আকারের দাগ পড়ে।
* আক্রমণ বেশি হলে সম্পূর্ণ গাছই পুড়ে যেতে পারে, ফলে ফসলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়।

রোগ দমন ব্যবস্থাপনা:

* রোগমুক্ত স্থান হতে সুস্থ সবল চারা/করম সংগ্রহ করা।
* কচুর জমিতে এ রোগ দেখা গেলে **টিল্ট নামক ছত্রাকনাশক (০.৫ মিলি/লিটার) ২-৩ বার স্প্রে করলে** এ রোগ দমন করা যায়।
* পরিষ্কার চাষাবাদ ও শস্য পর্যায় অবলম্বন করে এ রোগ কমানো যাবে।

গোড়া পচা রোগ বা ফুট/কলার রট **স্ক্লেরোশিয়াম রলফসি (Sclerotium rolfsii)** নামক এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ:

* এ রোগের আক্রমণে গাছের গোড়ায় সাদা বর্ণের মাইসেলিয়াম দেখা যায়।
* ভালো করে তাকালে কালচে বাদামী বর্ণের সরিষার দানার মতো **স্ক্লেরোশিয়া গঠন** দৃষ্টিগোচর হয়।
* আক্রান্ত গাছটি সম্পূর্ণ রূপে হলুদ হয়ে যায় এবং সবশেষে গাছটি **কলার (Collar) অঞ্চল হতে ঢলে পড়ে**।
* রোগের মারাত্মক আক্রমণে, **মাটির নিচের করম (Corm) ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও পুরো গাছ ঢলে পড়ে**।

রোগ দমন ব্যবস্থাপনা:

* রোগমুক্ত এলাকা হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
* ক্ষেতের পানি সরিয়ে **বেভিস্টিন (১ গ্রাম/লিটার) নামক ছত্রাকনাশক দিয়ে ফসলের গোড়ার মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে**। তবে ভিজিয়ে দেওয়ার ১ দিন পর আবার পানি দেওয়া যাবে।
* ফসল কর্তনের পর, **ফসলের অবশিষ্টাংশ সরিয়ে ফেলতে হবে**।
* পরিষ্কার চাষাবাদ ও শস্য পর্যায় অবলম্বন করে এ রোগ কমানো যাবে।

রাইজোম পচা / করম রট **পিথিয়াম আফানিডারমাটাম (Pythium aphanidermatum)** নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ:

* এ রোগের আক্রমণে **অল্প বয়স্ক গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি গাছ মারা যেতে পারে**।
* অধিক বয়স্ক গাছে, **এ রোগের আক্রমণে গাছ হলুদ হয়ে গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়, পরবর্তীতে পুরো গাছটি ঢলে পড়ে**।
* অধিক আক্রমণে **করমটি (Corm) পচে যায়, এমনকি গাছ হতে কোনো রকম ফলনই সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না**।

রোগ দমন ব্যবস্থাপনা:

* রোগমুক্ত এলাকা হতে **চারা/করম সংগ্রহ করে লাগাতে হবে**।
* পরিষ্কার চাষাবাদ, **শস্যাবর্তন অনুসরণ করতে হবে**।
* ফসল কর্তনের পর, **ফসলের অবশিষ্টাংশ ধ্বংস করতে হবে**।
* জমির পানি সরিয়ে **রিডোমিল গোল্ড (২ গ্রাম/লিটার) নামক ছত্রাকনাশক দিয়ে ফসলের গোড়ার মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে**। তবে ভিজিয়ে দেওয়ার ১ দিন পর আবার পানি দেওয়া যাবে।

বি.দ্র.- **কচুপাতায় ছত্রাকনাশক বা কীটনাশক ছিটানোর সময় ডিটারজেন্ট যেমন- সার্ফ অথবা হুইল পাউডার ২০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে**। তা না হলে ছিটানো ওষুধ পাতা থেকে গড়িয়ে পড়ে যাবে।

মুখী কচু

মুখী কচু একটি সুস্বাদু সবজি। এ সবজি খরিফ মৌসুমের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই এর চাষ হয়। মুখী কচু বাংলাদেশে **গুঁড়া কচু, কুঁড়ি কচু, ছড়া কচু, দুলি কচু, বিন্নি কচু** ইত্যাদি নামেও পরিচিত। মুখীর **ছড়া বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়**। মুখী কচুর **গাছ হলুদ হয়ে শুকিয়ে গেলে এ কচু তুলতে হয়**। এতে **৬-৭ মাস সময় লাগে**।

### **মুখী কচুর জাত**

#### **বিলাসী**

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত **১৮০টি জার্মপ্লাজম হতে গবেষণার মাধ্যমে** ‘বিলাসী’ নামে একটি **উফশী জাত উদ্ভাবন করা হয়** এবং **১৯৮৮ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়**। **বিলাসী গুণে উৎকৃষ্ট ও উচ্চ ফলনশীল**। এর **গাছ সবুজ, খাড়া, মাঝারি লম্বা**। এর **মুখী খুব মসৃণ, ডিম্বাকার** হয়। **সিদ্ধ মুখী নরম ও সুস্বাদু**। **সিদ্ধ করলে মুখী সমানভাবে সিদ্ধ হয় ও গলে যায় এবং গলা চুলকানিমুক্ত** অর্থাৎ **এ কচুতে ক্যালসিয়াম অক্সালেটের পরিমাণ কম থাকায় গলা চুলকায় না**। **জীবনকাল ২১০-২৮০ দিন**। সাধারণ অবস্থায় **এর ফলন হেক্টরপ্রতি প্রায় ২৫-৩০ টন**। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে **হেক্টরপ্রতি ৪০ টন পর্যন্ত ফলন হয়ে থাকে**।

#### **বারি মুখী কচু-২**

**দেশীয় জার্মপ্লাজম থেকে উপযোগিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে ২০১৩ সালে** এ জাতটি **অবমুক্ত করা হয়েছে**। **গাছ খাড়া, মাঝারি আকৃতির এবং সবুজ বর্ণের**। **পাতা সবুজ ও হৃদপিণ্ডাকৃতির**। **বোঁটা ও পত্রফলকের সংযোগস্থল সবুজ রঙের**। **মুখী ধূসর রঙের এবং শাঁস সাদা**। **মুখী সহজে সমানভাবে সিদ্ধ হয় এবং গলা চুলকানিমুক্ত**। সাধারণ অবস্থায় **এর ফলন হেক্টরপ্রতি প্রায় ৩৫ টন**। **বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই এর চাষ করা যায়**।

### **উৎপাদন প্রযুক্তি**

**মাটি:** **দোআঁশ মাটি মুখী কচুর জন্য উত্তম**। **বর্ষাকালে পানি দাঁড়ায় না এমন জমি নির্বাচন করতে হবে**।

**রোপণের সময়:** **মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি)**।

**রোপণ পদ্ধতি:** **একক সারি পদ্ধতি:** সারি থেকে সারির দূরত্ব **৬০ সেমি** এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব **৩৫ সেমি**।

**ডাবল সারি পদ্ধতি:** এ পদ্ধতিতে **৭৫ সেমি × ৬০ সেমি দূরত্ব বেশি উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে**। **৭৫ সেমি দূরে দূরে লম্বালম্বি দাগ টানতে হয়**। এই দাগের **উভয় পাশে ১০ সেমি দূর দিয়ে ৬০ সেমি পর পর বীজ লাগিয়ে যেতে হয়**। এতে **দুই সারির মধ্যে দূরত্ব ৫৫ সেমি এবং এক সারির দুই লাইনের মধ্যে দূরত্ব হয় ২০ সেমি**। এই পদ্ধতিতে **বীজ লাগালে ফলন প্রায় ৪০-৫০% বেড়ে যায়**। দুই সারির **৩টি বীজ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ উৎপন্ন করবে**।

**বীজের হার:** **মুখীর ছড়া ৪৫০-৬০০ কেজি/হেক্টর (১৫-২০ গ্রাম ওজনের মুখী)**।

**সার প্রয়োগ পদ্ধতি:** সম্পূর্ণ **গোবর বা খামারজাত সার, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট ও বরিক এসিড এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও এমওপি জমি প্রস্তুতির শেষ চাষের সময় ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে**। বাকি **অর্ধেক এমওপি চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর এবং বাকি ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে বীজ গজানোর ২০-২৫ দিন এবং ৪০-৫০ দিনের মধ্যে পার্শ্ব প্রয়োগ পদ্ধতিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে**।  
মুখী কচুর জন্য সার ব্যবস্থাপনা নিম্নরূপ:

* গোবর: প্রতি হেক্টরে ১০,০০০-১৫,০০০ কেজি
* ইউরিয়া: প্রতি হেক্টরে ৩০০-৩৫০ কেজি
* টিএসপি: প্রতি হেক্টরে ১৫০-২০০ কেজি
* এমওপি: প্রতি হেক্টরে ২৫০-৩৫০ কেজি
* জিপসাম: প্রতি হেক্টরে ১০০-১৩০ কেজি
* জিংক সালফেট: প্রতি হেক্টরে ১০-১৬ কেজি
* বরিক এসিড: প্রতি হেক্টরে ১০-১২ কেজি

**আগাছা দমন:** **মুখী কচু ৬ থেকে ৯ মাসের ফসল**। **গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় জমিতে প্রচুর আগাছা জন্মে**। **মুখী কচুর পুরো উৎপাদন মৌসুমে ৪-৬ বার আগাছা দমনের প্রয়োজন হয়**। বিশেষ করে **সারের উপরি প্রয়োগের আগে আগাছা দমন অত্যাবশ্যক**। অঙ্কুরোদ্গম পূর্ব **আগাছানাশক ম্যাগনাম গোল্ড (Magnum Gold) বীজ রোপণের পরপর বা পরের দিন প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলি ওষুধ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে**। **চারা লাগানোর দুই মাস পর হতে এক মাস অন্তর অন্তর চার বার নিড়ানী দ্বারা আগাছা দমন করতে হবে**।

**সেচ নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা:** **মুখী কচু খরা মৌসুমে লাগানো হলে বীজ অঙ্কুরোদগমের জন্য তো বটেই, প্রাথমিক বৃদ্ধি পর্যায়ে মাটির প্রকারভেদে ১০-২০ দিন পর পর সেচ দেওয়া প্রয়োজন হয়**। **বর্ষাকালে সেচ দেওয়ার দরকার পড়ে না তবে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে**। **মুখী কচুর উচ্চ ফলনের জন্য প্রয়োজনীয় সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা যথাসময়ে গ্রহণ করতে হবে**।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

গাছের গোড়ায় মাটি তোলা: রোপণের **৪০-৪৫ দিন পর** এবং **৯০-১০০ দিন পর** দুই সারির মাঝের মাটি কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে কচু গাছের গোড়ায় উঠিয়ে দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: বীজ রোপণের **ছয় মাস পর আগাম ফসল সেপ্টেম্বর (মধ্য-ভাদ্র) মাস থেকে মুখী সংগ্রহের উপযোগী হয়** এবং ঐ সময় **গাছের পাতা হলুদ বর্ণ ধারণ করতে থাকে এবং ধীরে ধীরে মারা যায়**। কোদাল দিয়ে **মাটি খুঁড়ে মুখী সংগ্রহ করা হয়**।

ফলন: উচ্চ ফলনশীল **বিলাসী জাতে গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩০-৩৫ টন**। মোট ফলনের **৭৫-৮৫% মুখী (Corm) এবং বাকিটা গুঁড়িকন্দ (Cormel)**।

ওলকচুর জাত:

**বারি ওলকচু-১**

বৈশিষ্ট্য:

* **পত্রকগুলি ঘনভাবে বিন্যস্ত, একটার সাথে আরেকটা লেগে থাকে**।
* **ভূয়াকাণ্ডে সাদা ছোপ ছোপ দাগগুলো বড় আকারের এবং অল্প সংখ্যক কাঁটা কাঁটা গঠন থাকে বিধায় ভূয়াকাণ্ডটি হালকা খসখসে হয়**।
* **প্রধান গুঁড়িকন্দ বড় আকারের হয়, প্রতিটি গুঁড়িকন্দ হতে গড়ে ৩-৩.৫ টি করমেল উৎপন্ন করে**।
* **গুঁড়িকন্দের মাংশল অংশ ক্রিম রঙের এবং ক্যারোটিন সমৃদ্ধ**।
* **একক গুঁড়িকন্দের ওজন ২-৫ কেজি**।
* **হেক্টর প্রতি ফলন: ৪৫-৫৫ টন**।

উপযোগী এলাকা: বাংলাদেশে **সব অঞ্চলেই উঁচু জমিতে চাষ করা যায়**।

সারের পরিমাণ:

* **গোবর:** প্রতি হেক্টরে **১০,০০০ কেজি**
* **ইউরিয়া:** প্রতি হেক্টরে **২৫০-৩৩০ কেজি**
* **টিএসপি:** প্রতি হেক্টরে **১৫০-২০০ কেজি**
* **এমওপি:** প্রতি হেক্টরে **২৫০-৩৫০ কেজি**
* **জিপসাম:** প্রতি হেক্টরে **১০০-১৩০ কেজি**
* **জিংক সালফেট:** প্রতি হেক্টরে **১০-১৬ কেজি**
* **বরিক এসিড:** প্রতি হেক্টরে **১০-১২ কেজি**

বপনের সময়: **মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি- মধ্য মার্চ) মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়**। প্রয়োজনে **মধ্য-চৈত্র থেকে মধ্য-বৈশাখ (এপ্রিল) মাসেও লাগানো যায় তবে এরপরে রোপণ করলে ফলন কমে যায়**।

ফসল উত্তোলনের সময়: **২১০-২৭০ দিন পর**।

**বারি ওলকচু-২**

বৈশিষ্ট্য:

* **পত্রকগুলি হালকাভাবে বিন্যস্ত, একটা থেকে আরেকটা পৃথক থাকে**।
* **ভূয়াকাণ্ডে সাদা ছোপ ছোপ দাগগুলো ছোট আকারের এবং অধিক সংখ্যক কাঁটা কাঁটা গঠন থাকে বিধায় ভূয়াকাণ্ডটি বেশ খসখসে হয়**।
* **প্রধান গুঁড়িকন্দ মাঝারি আকারের হয়, প্রতিটি গুঁড়িকন্দ হতে গড়ে ৮-৯ টি করমেল উৎপন্ন করে**।
* **গুঁড়িকন্দের উপরের অংশ পার্পল রঙের, এর মাংশল অংশ হলুদ বর্ণের**।
* **একক গুঁড়িকন্দের ওজন ১-৩ কেজি**।
* **হেক্টরপ্রতি ফলন: ৩৫-৪৫ টন**।

উপযোগী এলাকা: বাংলাদেশে **সব অঞ্চলেই উঁচু জমিতে চাষ করা যায়**।

বপনের সময়: **মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়**। প্রয়োজনে **মধ্য-চৈত্র থেকে মধ্য-বৈশাখ (এপ্রিল) মাসেও লাগানো যায় তবে এরপরে রোপণ করলে ফলন কমে যায়**।

ফসল উত্তোলনের সময়: **২১০-২৭০ দিন পর**।

**ওলকচু** উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন ও তৈরি: সু-নিষ্কাশিত এঁটেল দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ মাটি উপযোগী। অতিরিক্ত এঁটেল ও বেলে মাটিতে চাষ না করাই ভালো। মাটির ‘জো’ থাকা অবস্থায় মাটির প্রকারভেদে ৩-৪টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিয়ে ভালো করে মই দিয়ে মাটি চেপে দিতে হবে।

বীজ তৈরি: সাধারণত বিভিন্ন আকারের মুখী এক/দুই বছর আবাদ করার পর যে গুঁড়িকন্দ তৈরি হয়, তাই বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে ছোট আকারের গুঁড়িকন্দগুলিকে এক বছর রোপণ করে বীজ তৈরি করতে হয়।বীজ বপনের সময়: মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। প্রয়োজনে মধ্য-চৈত্র থেকে মধ্য-বৈশাখ (এপ্রিল) মাসেও লাগানো যায় তবে এরপরে রোপণ করলে ফলন কমে যায়।বীজ বপনের দূরত্ব: অন্যান্য ফসলের মতো ওলকচুর জন্য কোনো একক দূরত্ব নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বীজের আকারের অসমতার জন্য বিভিন্ন আকারের বীজ বিভিন্ন দূরত্বে বপণ করতে হবে।

স্বাভাবিক ও বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য বীজ বপনের দূরত্ব:

বীজের আকার (৫০ গ্রাম): স্বাভাবিক - ৪০০-৬০০ সেমি, বাণিজ্যিক - ৫০ সেমি × ৪০ সেমি, ৬০ সেমি × ৫০ সেমিবীজের আকার (৫০-২০০ গ্রাম): স্বাভাবিক - ৬০০-৮০০ সেমি, বাণিজ্যিক - ৬০ সেমি × ৪৫ সেমি, ৬০ সেমি × ৬০ সেমি।বীজের আকার (২০০-৪০০ গ্রাম):

ফসলের পরিচর্যা

সার প্রয়োগ: আশানুরূপ ফলন পেতে হলে নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে। সম্পূর্ণ গোবর এবং ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সারের অর্ধেক জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক বীজ বপনের গর্তে বা লাইনে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান বা ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। রোপণের ৮০-৮৫ দিন পর ভালোভাবে আগাছা পরিষ্কার করে প্রথমবার এবং ১১০-১১৫ দিন পর দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করতে হবে।

পরিচর্যা: বীজ লাগানোর পরে যদি মাটির ‘জো’ না থাকে এবং বৃষ্টিপাত না হয় তবে সেচ দিতে হবে। দুই সারি বা প্রতি সারির পার্শ্ব দিয়ে হালকা নালা তৈরি করে দিতে হবে যাতে সহজেই বৃষ্টির পানি চলে যেতে পারে। ধান, গমের খড় বা কচুরিপানা দ্বারা আচ্ছাদন (মালচ) দিলে ফলন অনেক গুণ বৃদ্ধি করা যায় এবং সহজেই আগাছা দমন করা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন আচ্ছাদন ব্যবহার করে শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। জমি সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

কীট পতঙ্গ ও রোগবালাইয়ের প্রতিকার: ওলকচুর ক্ষেত্রে কীট পতঙ্গ ও রোগবালাইয়ের তেমন কোনো সমস্যা নেই। তবে মাঝে মাঝে লিফ বাইট (পাতা ও ডগা পচা রোগ), কলার রট প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়।

লিফ বাইট: এ রোগে পাতা বেশি আক্রান্ত হয়। কিছু ক্ষেত্রে কাণ্ডেও লিফ বাইট রোগের লক্ষণ দেখা যায়। এ রোগের প্রতিকারের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২.০ গ্রাম ডায়থেন এম-৪৫ বা রিডোমিল এম জেড বা এক্রোবেট এম জেড ছত্রাকনাশক ১৫ দিন পর পর ৩ বার প্রয়োগ করতে হবে।

কলার রট: এ রোগ শস্যের বৃদ্ধির শেষের দিকে দেখা যায়। এ রোগে মাটির সংযুক্ত স্থান আক্রান্ত হয়। কলার রট রোগে আক্রান্ত গাছ মাটি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে। আক্রান্ত গাছে ভিটাভ্যাক্স-২০০ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম মিশিয়ে সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: একটি কন্দ থেকে ২-৪টি পর্যন্ত ভূয়া কাণ্ড বের হতে দেখা যায়। একটি নতুন ভূয়া কাণ্ড বের হওয়ার পর পুরানটি মারা যায়। ক্ষেতে যখন শতকরা ৮০ ভাগ গাছ হলুদ হয়ে যায় তখন ফসল পরিপক্ক হবে এবং তখন থেকে ফসল সংগ্রহ করা যাবে। বীজের জন্য ক্ষেতের গাছ সম্পূর্ণ রূপে শুকিয়ে মারা যাওয়ার পর সংগ্রহ করতে হবে। বাজার মূল্য এবং বাজারের চাহিদা মোতাবেক ঠিকমতো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে সংগ্রহ করতে হবে। অপরিপক্ক ওলও সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বীজ সংরক্ষণ: ওলের গুড়িকন্দ, ক্ষুদ্রাকার গুঁড়িকন্দ ও মুখী বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বীজ তোলার সময় যদি ভিজা থাকে তবে তা হালকা রোদে শুকিয়ে শীতল স্থানে সংরক্ষণ করতে হয়। দীর্ঘ দিন সংরক্ষণ করতে হলে ছায়াযুক্ত মাটিতে সমানভাবে গর্ত করে তার ভেতর ওল পাশাপাশি সাজিয়ে ১৫-২০ সেমি বালি মিশ্রিত মাটি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। বীজ যে জমিতে থাকে যদি অন্য কাজে প্রয়োজন না হয় তবে জমিতেই রেখে দেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পূর্বে বীজ উঠিয়ে পুনরায় রোপণ করতে হবে।সারের পরিমাণ (প্রতি হেক্টরে):গোবর বা আবর্জনা পচা সার: ২০ টন,ইউরিয়া: ৩২৫ কেজি,টিএসপি: ২১০ কেজি,এমপি: ১৭৫ কেজি

কামরাঙ্গা :

অম্লমধুর স্বাদযুক্ত এবং ভিটামিন ‘এ’ ও ‘সি’ সমৃদ্ধ ফল কামরাঙ্গা আমাদের দেশে সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ফল।দেশের সর্বত্র বাড়ির আঙ্গিনায় ২/১টি কামরাঙ্গা গাছ দেখাযায়। গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ঢাকা, সিলেট ওপার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কামরাঙ্গা বেশি উৎপন্ন হয়।কামরাঙ্গা ফল হতে জ্যাম, জেলী, মোরব্বা, চাটনি, আচার ইত্যাদি তৈরি করা হয়। কামরাঙ্গা একটি রপ্তানিযোগ্য ফলহওয়ায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদের প্রচুর সম্ভবনা রয়েছে।

মাটি ও জলবায়ু :

যে কোন প্রকার মাটিতে এর চাষ করা যায়। তবে সুনিষ্কাশিত গভীর দোআঁশ মাটি কামরাঙ্গা

চাষের জন্য উত্তম। উষ্ণ ও আদ্র জলবায়ু কামরাঙ্গা চাষের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের

আবহাওয়ায় কামরাঙ্গা চাষ করা সম্ভব। তবে দেশের পাহাড় অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কামরাঙ্গা চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এদের কিছুটা ঠাণ্ডা সহ্য করার ক্ষমতা আছে।

কামরাঙ্গার জাত :

বারি কামরাঙ্গা-১ :

উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ মাঝারী, মধ্যম খাড়া ও ঝোপালো। বছরে তিনবার ফল দেয় (জুলাই-আগস্ট, নভেম্বর-ডিসেম্বর এবং ফেব্রুয়ারি)। ফল মাঝারী (গড় ওজন ৯৭ গ্রাম), লম্বাটে, রং হালকা হলুদ, শাঁস সাদা, রসালো, কচকচে মিষ্টি (টিএসএস ৭.৫%) এবং ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯৯%। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩৫ টন। সমগ্র দেশে চাষোপযোগী এবং জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

বারি কামরাঙ্গা-২ :

উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ মাঝারী, মধ্যম খাড়া ও মধ্যম ঝোপালো। বছরে তিনবার ফল দেয় (জানুয়ারি, জুলাই, এবং অক্টোবর)। ফল মাঝারী (গড় ওজন ১০০ গ্রাম), ডিম্বাকৃতির ও রং হালকা হলুদ। শাঁস সাদা, রসালো, কচকচে ও মিষ্টি (টিএসএস ৮.০%)। এবং ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯৯%। হেক্টরপ্রতি

ফলন ৫৩ টন। সমগ্র দেশে চাষোপযোগী এবং জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

বংশ বিস্তার:

বীজ ও অঙ্গজ পদ্ধতিতে কামরাঙ্গার বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। বীজের গাছে মাতৃ গাছের গুণাগুণ পুরোপুরি বজায় থাকে না। বীজের গাছে ফল দিতে ৩-৪ বছর সময় লাগে। অঙ্গজ পদ্ধতিতে তৈরি কলমের গাছে মাতৃ গাছের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে এবং লাগানোর পরবর্তী বছর থেকেই ফল দিতে শুরু করে। বীজ থেকে চারা তৈরি করে ১০-১২ মাস বয়ষ্ক সুস্থ সবল চারার উপর ৫-৬ মাস বয়ষ্ক উপজোড় ভিনিয়ার বা ফাটল পদ্ধতির মাধ্যমে কলম করা হয়। সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাস কলম করার উপযুক্ত সময়। এক বছর বয়ষ্ক কলমের চারা জমিতে রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

উৎপাদন প্রযুক্তি :

জমি নির্বাচন ও তৈরি :

বর্ষায় পানি দাঁড়ায় না এমন উঁচু এবং মাঝারী উঁচু জমি কামরাঙ্গার জন্য নির্বাচন করতে হবে।

উন্মুক্ত বা আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে কামরাঙ্গা চাষ করা যায়। বাগান আকারে চাষ করতে হলে নির্বাচিত জমি ভাল করে চাষ ও মই দিয়ে সমতল এবং আগাছামুক্ত করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি:

সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা আয়তাকার এবং পাহাড়ী ভূমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে চারা রোপণ করা হয়।

রোপণের সময়:

চারা বা কলম রোপণের উপযুক্ত সময় মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য-ভাদ্র (জুন-সেপ্টেম্বর) মাস। তবে সেচ

সুবিধা থাকলে আশ্বিন- কার্তিক (অক্টোবর) মাস পর্যন্ত চারা/কলম রোপণ করা যেতে পারে।

গর্ত তৈরি:

রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৭ X ৭ মিটার দূরত্বে ১ X ১ X ১ মিটার আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের

উপরের মাটির সাথে ১০-১৫ কেজি জৈব সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি ও ১০০ গ্রাম জিপসাম সার

ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে পরিমাণমতো পানি দিতে হবে এবং এ অবস্থায় ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি:

গর্তের মাঝখানে চারা বসিয়ে গোড়ার মাটি একটু উঁচু করে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর একটা শক্ত

কাঠির সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। তারপর সেচ দিতে হবে।

সার প্রয়োগ :

গাছের বয়স অনুযায়ী সারের পরিমাণ বিভিন্ন হয়। ১ থেকে ৩ বছর বয়সী গাছের জন্য ১০ থেকে ১৫ কেজি জৈব সার, ৩০০ থেকে ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫০ থেকে ৩০০ গ্রাম টিএসপি এবং ২৫০ থেকে ৩০০ গ্রাম এমওপি প্রয়োজন হয়। ৪ থেকে ৬ বছর বয়সী গাছের জন্য প্রয়োজন হয় ১৫ থেকে ২০ কেজি জৈব সার, ৪০০ থেকে ৬০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ থেকে ৪০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৩০০ থেকে ৪০০ গ্রাম এমওপি। ৭ থেকে ১০ বছর বয়সী গাছের জন্য ২০ থেকে ৩০ কেজি জৈব সার, ৬০০ থেকে ৮০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৪০০ থেকে ৪৫০ গ্রাম এমওপি ব্যবহার করতে হয়। ১০ বছরের ঊর্ধ্বে গাছের জন্য ৩০ থেকে ৪০ কেজি জৈব সার, ৮০০ থেকে ১০০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ থেকে ৬০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৪৫০ থেকে ৫০০ গ্রাম এমওপি প্রয়োগ করা উচিত।

উল্লিখিত সার ২ কিস্তিতে প্রথমবার বর্ষার আগে ও দ্বিতীয়বার বর্ষার শেষের দিকে প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের

পর প্রয়োজনে পানি সেচ দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ:

চারা রোপণের পর ১ মাস নিয়মিত সেচ প্রদান করতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে এবং ফল ধরার পর প্রতি ১৫

দিন অন্তর ২-৩ বার সেচ দিলে ফল ঝরার মাত্রা কমে এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। বর্ষা মৌসুমে বাগানে পানি নিষ্কাশনের

ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ:

রোপণকৃত চারা/কলমকে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য এর গোড়ার দিকের ডাল ছাঁটাই করতে হবে।

প্রধান কাণ্ডটিতে মাটি থেকে কমপক্ষে ১ মিটারের মধ্যে কোন ডাল রাখা চলবে না। এ ছাড়া শীতকালীন ফল সংগ্রহের

পর মচকানো, মরা, রোগাক্রান্ত, পোকাক্রান্ত ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে।

ফল সংগ্রহ:

পুষ্ট, রং উজ্জ্বল ও হালকা হলুদ হলেই ফল সংগ্রহ করতে হয়। গাছে ঝাকি দিয়ে ফল আহরণ করা যাবে

না এবং আহরণ কালে ফল যাতে মাটিতে না পড়ে এবং কোনভাবে আঘাতপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে সতর্ক নজর রাখতে

হবে। বৃষ্টির পরপরই ফল সংগ্রহ করা ঠিক নয়। হাত দিয়ে বা জাল লাগানো কোটার সাহায্যে খুব সাবধানে ফল

সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত ফল সরাসরি রোদে না রেখে ছায়ায় রাখতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা :

এ্যানথ্রাকনোজ রোগ :

এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। পাতা, ফুল ও ফলে এ রোগ হতে

পারে। প্রথমে ছোট ছোট বাদামী রঙের দাগের মাধ্যমে এ রোগের শুরু হয় এবং

আস্তে আস্তে এ দাগগুলো বড় হয়ে কালো বর্ণ ধারণ করে এবং আক্রান্ত স্থান পচে

যায়। আক্রান্ত পাতা, ফুল ও ফল ঝরে যেতে পারে।

প্রতিকার :

আক্রান্ত পাতা, ফুল ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগের লক্ষণ দেখা দিলে অটোস্টিন অথবা নোইন ৫

ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন অন্তর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে।

বাকল ও ডাল ছিদ্রকারী পোকা :

কামরাঙ্গার ক্ষতিকর পোকাসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। এ পোকা গাছের বাকল ও

ডাল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে। তাছাড়া কখনও কখনও এরা প্রশাখার কর্তিত অংশ

দিয়েও ডালের ভিতর প্রবেশ করে। এ পোকার কীড়া রাতের বেলায় গাছের বাকল

খেয়ে গাছের খাদ্য চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায়। আক্রমণ বেশি হলে পুরো গাছটাই এক

সময় শুকিয়ে মারা যায়। গাছে এ পোকার উপস্থিতি খুব সহজেই ডালের গায়ে ঝুলে

থাকা কাঠের গুঁড়া-মিশ্রিত মলের ছোট ছোট দানা দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব। দিনের

বেলায় কীড়া গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকে এবং রাতের বেলা সচল হয়।

প্রতিকার :

ডালের গায়ে ঝুলে থাকা কাঠের গুঁড়া মিশ্রিত মল পরিষ্কার করতে হবে ও কাণ্ডের

ভিতরের পোকা বের করে মেরে ফেলতে হবে। ডালের গর্তের মধ্যে কেরোসিন বা

পেট্রোল অথবা ন্যাপথোলিন প্রবেশ করিয়ে কাদা মাটি দ্বারা ছিদ্রের মুখ বন্ধ করে দিতে

হবে। মার্শাল-২০ ইসি অথবা রগর/রকসিয়ন-৪০ ইসি জাতীয় কীটনাশক ২ মিলি প্রতি

লিটার পানির সাথে মিশিয়ে গাছে এক সপ্তাহ পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে।

পোকায় খাওয়া বাকল চেঁছে কপার জাতীয় ছত্রাকনাশকের প্রলেপ দিতে হবে।

ফল ছিদ্রকারী পোকা :

টক জাতের কামরাঙ্গায় এ পোকার আক্রমণ কম হলেও বারি কামরাঙ্গা-১, বারি কামরাঙ্গা-২ ও অন্যান্য মিষ্টি জাতে

মাঝে মাঝে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়। এ পোকা ফলের গায়ে ডিম পাড়ে এবং ডিম থেকে উৎপন্ন

শুককীট ফলের শাঁস খেয়ে ভিতরে ঢুকে। এতে ফল খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়।

প্রতিকার :

আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে কীড়াসহ মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে। বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আলোক

ফাঁদ ব্যবহার করেও এদের দমন করা যায়। ফল ধরার পর সুমিথিয়ন/লেবাসিড ২ মিলি হারে প্রতি লিটার পানিতে

মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণি :

টিয়া পাখি কামরাঙ্গার প্রধান শত্রু। এরা যতটুকু ফল খায় তার চেয়ে অনেক বেশি নষ্ট করে। ফল সামান্য বড় হওয়ার

পর থেকেই টিয়া পাখির আক্রমণ শুরু হয়।

প্রতিকার :

গাছকে জাল দ্বারা ঢেকে অথবা টিন পিটিয়ে শব্দ সৃষ্টির মাধ্যমে টিয়া পাখির আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করতে হবে।

তৈকর:

তৈকর দেশের একটি আদি ফল। বাংলাদেশের সিলেট জেলায় তৈকরের চাষ

হয় এবং এ অঞ্চলে ফলটির যথেষ্ট চাহিদাও রয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য

জেলায়ও এ ফলের চাষ সম্ভব। ফল উপ-বৃত্তাকার ও বড়। কাঁচা ও পাকা

ফলের রং যথাক্রমে সবুজ এবং হলুদ। তৈকরের ঔষধী গুণাগুণ রয়েছে।

তৈকর সিলেট জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এযাবত উৎপাদিত হয়ে আসছে। এটি

একটি অপ্রধান টক জাতীয় ফল যা তরকারীতে এবং আচার, জ্যাম, জেলী

তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

তৈকরের জাত:

বারি তৈকর-১:

বারি তৈকর-১ জাতটি ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। বছরে ২ বার ফল

দেয়। গাছ পিরামিড আকৃতির, বড় এবং গাছে সারা বছর বড় বড় সবুজ পাতা

থাকে। প্রথমবার ফুল আসে মধ্য-শ্রাবণ থেকে মধ্য-আশ্বিন (আগস্ট-সেপ্টেম্বর)

মাসে এবং দ্বিতীয়বার ফুল আসে মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি)

মাসে। প্রথমবার ফল সংগ্রহের উপযোগী হয় মধ্য-কার্তিক থেকে মধ্য-পৌষ

(নভেম্বর-ডিসেম্বর) মাসে এবং দ্বিতীয়বার ফল সংগ্রহের উপযোগী হয় মধ্য-চৈত্র

থেকে মধ্য জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল-মে) মাসে। ফল চ্যাপ্টা-গোলাকৃতির, আকারে বড়

(৭০০-৭৫০ গ্রাম)। প্রতিটি ফলের দৈর্ঘ্য ১০.৩ সেমি এবং প্রস্থ ৯.২ সেমি। কচি ফলের রং সবুজ, পাকা ফলের রং

হলুদ। ফলপ্রতি বীজের সংখ্যা ৪-৭টি। ফলের স্বাদ যথেষ্ট টক। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৩০০-৩৫০টি। হেক্টরপ্রতি ফলন

৭০-৭৫ টন। বৃহত্তর সিলেট জেলায় চাষের জন্য উপযোগী। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

উৎপাদন প্রযুক্তি:

মাটি:

বেলে দোআঁশ থেকে পলি দোআঁশ মাটি তৈকর চাষের জন্য উত্তম। সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চলের নিকাশযুক্ত অম্লীয়

মাটি তৈকর উৎপাদনের জন্য সর্বোত্তম।

গর্ত তৈরি:

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৬ X ৬ মিটার দূরত্বে ১ X ১ X১ মিটার আকারের গর্ত করতে হবে।

গর্তের উপরের মাটির সাথে ১৫-২০ কেজি জৈব সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি ও ১০০ গ্রাম জিপসাম

সার ভালোভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে। হেক্টরপ্রতি ২৭৮টি চারা বা গুটির প্রয়োজন হবে।

চারা রোপণ:

গর্ত তৈরির কমপক্ষে ১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে। চারাটি গর্তে সোজা করে লাগাতে হবে।

লাগানোর পর ঝর্ণা দিয়ে পানি সেচ, খুঁটি ও বেড়া দিতে হবে।

সার প্রয়োগ:

গাছের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য সময়মতো, সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে।

গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বয়সভেদে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল:

গাছের বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হয়। ১ থেকে ২ বছর বয়সী গাছের জন্য ৫ থেকে ১০ কেজি গোবর সার, ২০০ থেকে ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০ থেকে ৩০০ গ্রাম টিএসপি এবং ২০০ থেকে ৩০০ গ্রাম এমওপি প্রয়োজন হয়। ৩ থেকে ৪ বছর বয়সী গাছের জন্য ১০ থেকে ১৫ কেজি গোবর সার, ৩০০ থেকে ৪৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ থেকে ৪৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ৩০০ থেকে ৪৫০ গ্রাম এমওপি প্রয়োগ করা উচিত। ৫ থেকে ১০ বছর বয়সী গাছের জন্য ২০ থেকে ২৫ কেজি গোবর সার, ৪৫০ থেকে ৬০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৪৫০ থেকে ৬০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৪৫০ থেকে ৬০০ গ্রাম এমওপি প্রয়োজন হয়। ১০ থেকে ১৫ বছর বয়সী গাছের জন্য ২৫ থেকে ৩০ কেজি গোবর সার, ৬০০ থেকে ৭৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৬০০ থেকে ৭৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ৬০০ থেকে ৭৫০ গ্রাম এমওপি ব্যবহার করা উচিত। ১৫ বছরের বেশি বয়সী গাছের জন্য ৩০ থেকে ৪০ কেজি গোবর সার, ১০০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১০০০ গ্রাম এমওপি প্রয়োগ করতে হয়।

গাছের ডালপালা যে পর্যন্ত বিস্তরিত হয়েছে তার নিচের জমি কোদাল দিয়ে হালকা করে কুপিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সাধারণত গাছের গোড়ার এক মিটার এলাকায় কোন সক্রিয় শিকড় থাকে না, তাই সার প্রয়োগের সময় এই এলাকায়

সার প্রয়োগ করা উচিত নয়। পাহাড়ী অঞ্চলে ডিবলিং পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করা হলে ভূমি ক্ষয় হ্রাস পাবে।

সেচ প্রয়োগ:

শুকনা মৌসুমে ১৫ দিন অন্তর পানি সেচ দেয়া উত্তম। পাহাড়ী অঞ্চলে বর্ষার শেষে মালচিং করা যেতে

পারে। এতে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মনে রাখতে হবে, সার প্রয়োগের পর পানি সেচ অত্যন্ত জরুরি ।

জমিতে ‘জো’ না থাকলে ফুল আসার পর ও ফল মটর দানার সময় গাছে অবশ্যই পানি সেচ দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ:

বছরে সাধারণত ২ বার ফল সংগ্রহ করা হয়। পরিপক্ক অবস্থায় ফলের রং হলদে হয়।

লটকন :

লটকন বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত অপ্রধান ফল। প্রধান কাণ্ড ও ডালপালা থেকে

সরাসরি ফুলের মঞ্জরী বের হয়। ছড়া জাতীয় মঞ্জরীতে এক লিঙ্গিক ফুল উৎপন্ন হয়

অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ গাছ আলাদা। নরসিংদী, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নেত্রকোণা ও

সিলেট এলাকায় উল্লেখযোগ্যভাবে এর চাষাবাদ হয়। বিভিন্ন দেশে সীমিত আকারে

লটকন রপ্তানি হচ্ছে।

লটকনের জাত:

বারি লটকন-১:

লটকন বাংলাদেশে অত্যন্ত মধুর স্বাদযুক্ত একটি সুপরিচিত ফল। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত

জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৮ সালে ‘বারি লটকন-১’ জাতটি উদ্ভাবন

করা হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৮ টন। ফল গোলাকৃতির, রং হালকা হলুদ থেকে বাদামী

বর্ণের, শাঁস নরম, রসালো ও সুগন্ধযুক্ত। ফলের গড় ওজন ১৫ গ্রাম। এতে ৪-৫টি কোষ

থাকে। টিএসএস ১২.০০-১২.৫% জাতটি বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষোপযোগী।

উৎপাদন প্রযুক্তি:

মাটি:

সুনিষ্কাশিত প্রায় সব ধরনের মাটিতেই লটকনের চাষ করা যায়। তবে বেলে দোআঁশ মাটি লটকন চাষের জন্য

সবচেয়ে উপযোগী। লটকন গাছ স্যাঁত স্যাঁতে ও আংশিক ছায়াযুক্ত পরিবেশে ভাল জন্মে কিন্তু জলাবধদ্ধতা সহ্য

করতে পারে না।

জমি তৈরি :

চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে।

গর্ত তৈরি :

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৭ X ৭ মিটার দূরত্বে ১ X ১ X ১ মিটার আকারের গর্ত করতে হবে।

প্রতি গর্তে ১৫-২০ কেজি জৈব সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে

ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। মাটি শুকনা হলে গর্তে পানি দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। এভাবে

১০-১৫ দিন গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। তারপর ভালভাবে আবার কুপিয়ে চারা/কলম লাগাতে হবে।

চারা রোপণ:

গর্ত করার ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে। চারা লাগানোর

পরপরই পানি ও খুঁটি দিতে হবে। প্রয়োজনে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

রোপণের সময়:

বৈশাখ-জ্যৈষ্ট (এপ্রিল-মে) মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে বর্ষার শেষের দিকে অর্থাৎ

ভাদ্র-আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসেও গাছ রোপণ করা যেতে পারে।

সার প্রয়োগ:

প্রত্যাশিত ফলন ও গুণগত মানসম্পন্ন ফল পেতে হলে লটকন গাছে নিয়মিত সার প্রয়োগ করতে হবে।

গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের

পরিমাণ নিচের ছকে দেয়া হল:

গাছের বয়স ১ থেকে ৪ বছর হলে প্রতি গাছে ১০ কেজি গোবর, ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০ গ্রাম টিএসপি, ২০০ গ্রাম এমওপি এবং ১০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করতে হয়। ৫ থেকে ১০ বছর বয়সী গাছের জন্য ২০ কেজি গোবর, ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ গ্রাম টিএসপি, ৩০০ গ্রাম এমওপি এবং ২০০ গ্রাম জিপসাম ব্যবহার করা উচিত। ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সী গাছের জন্য প্রয়োজন হয় ৩০ কেজি গোবর, ৮০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৪০০ গ্রাম টিএসপি, ৪০০ গ্রাম এমওপি এবং ২৫০ গ্রাম জিপসাম। ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে গাছের জন্য ৩০ থেকে ৪০ কেজি গোবর, ১০০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ৫০০ গ্রাম এমওপি এবং ৩০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করা উচিত।

গাছের গোড়ার ০.৫-১.০ মিটার দূর থেকে যতটুকু জায়গায় দুপুর বেলা ছায়া পড়ে ততটুকু জায়গায় সার ছিটিয়ে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে অথবা চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটিতে রস কম থাকলে সার প্রয়োগের পরপরই পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে (১ম কিস্তি ফল সংগ্রহের পরপর, ২য় কিস্তি বর্ষার শেষে এবং ৩য় কিস্তি শীতের শেষে) প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সেচ প্রয়োগ:

চারা রোপণের প্রথমদিকে ঘন ঘন সেচ দেয়া দরকার। ফল ধরার পর শুকনো মৌসুমে শীতের শেষে

গাছে ফুল আসার পর ২/১টি সেচ দিতে পারলে ফলের আকার বড় হয় ও ফলন বাড়ে।

ডাল ছাঁটাই:

গাছের মরা ডাল এবং রোগ ও পোকা আক্রান্ত ডাল ছাঁটাই করে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ:

শীতের শেষে গাছে ফুল আসে এবং জুলাই-আগস্ট মাসে ফল পাকে। ফলের রং হালকা হলুদ থেকে ধূসর

বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

ফলন:

কলমের গাছে সাধারণত ৪ বৎসর বয়স থেকে ফল আসা শুরু হয় এবং সাধারণত ২০-২৫ বছরের গাছে

সর্বোচ্চ ফলন হয়ে থাকে। অবস্থাভেদে গাছের বয়সের উপর ভিত্তি করে গাছপ্রতি ৪ কেজি থেকে ১২০/১৩০ কেজি

পর্যন্ত ফলন হয়ে থাকে।

অন্যান্য পরিচর্যা:

ফল ছিদ্রকারী পোকা :

ফল ছোট অবস্থায় যখন ফলের খোসা নরম থাকে তখন এই পোকা ফলের খোসা

ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। পরবর্তীকালে ডিম থেকে কীড়া উৎপন্ন হয় এবং ফল

পাকলে ফলের নরম শ্বাস খেয়ে থাকে।

প্রতিকার:

 আক্রান্ত ফল পোকাসহ নষ্ট করে ফেলতে হবে।

 প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে পারফেকথিয়ন বা লেবাসিড ৫০ ইসি মিশিয়ে ১৫

দিন অন্তর ২-৩ বার ফল ছোট থাকা অবস্থায় গাছে স্প্রে করতে হবে।

চেফার বিটল :

এই পোকা পাতার নিচে ডিম পাড়ে এবং ডিম থেকে কীড়া উৎপন্ন হওয়ার পর কীড়া পাতা

খেয়ে ছিদ্র করে ফেলে এবং আস্তে আস্তে সমস্ত পাতা খেয়ে জালের মতো করে ফেলে।

প্রতিকার :

সুমিথিয়ন/ডেবিকুইন ৪০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

স্কেল পোকা:

এই পোকা প্রথমে পাতার নিচে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা বের হলে এরা পাতার রস শোষণ করে খেতে থাকে। আস্তে আস্তে এরা কচি ডালেও আক্রমণ করে অবশেষে সমস্ত গাছকে মেরে ফেলে।

প্রতিকার :

এই পোকার আক্রমণ দেখা যাওয়া মাত্র ব্রাশ দিয়ে ঘষে মেরে ফেলতে হবে অথবা সাবানের পানি দিয়ে স্প্রে করলেও প্রাথমিকভাবে দমন করা যায়। আক্রমণ বেশি হল ট্রেসার/০.২ এমএল/লিটার) অথবা ফিপ্রোনিল (১ এমএল/লিটার) অথবা একতারা (০.৫ গ্রাম/লিটার) হারে স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

এ্যানথ্রাকনোজ:

কলেটোট্রিকাম সিডি নামক ছত্রাক লটকনের এ্যানথ্রাকনোজ রোগের কারণ। গাছের পাতা, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা ও ফল এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। ফলের গায়ে ছোট ছোট কাল দাগ এ রোগের প্রধান লক্ষণ। ফল শক্ত, ছোট ও বিকৃত আকারের হতে পারে। ফল পাকা শুরু হলে দাগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে থাকে এবং ফলটি ফেটে বা পচে যেতে পারে।

প্রতিকার:

গাছের নিচে ঝরে পড়া পাতা ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।গাছে ফল ধরার পর টপসিন- এম অথবা নোইন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা টিল্ট-২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

হঠাৎ করে গাছ মারা যাওয়া (উইল্ট):

ফিউজেরিয়াম নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ সমস্যা হয়। প্রথমে পাতা হলুদ হয়ে আসে এবং পরে শুকিয়ে যায়। এভাবে পাতার পর শাখা-প্রশাখা এবং ধীরে ধীরে সমন্ত গাছ ৮-১০ দিনের মধ্যে নেতিয়ে পড়ে ও মারা যায়।

প্রতিকার :

এ রোগের কোন প্রতিকার নেই। তবে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো নেয়া হলে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

 দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

 রোগের প্রাথমিক অবস্থায় বর্দোমিক্সার অথবা কুপ্রাভিট অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড প্রতি লিটার পানিতে ২

গ্রাম হারে মিশিয়ে ¯স্প্রে করা যেতে পারে। বাগানের মাটির অম্লত্ব কমানোর জন্য জমিতে চুন প্রয়োগ করতে হবে (২৫০-৫০০ গ্রাম/গাছ)।রোগ প্রতিরোধী আদিজোড়ের উপর কলম করতে হবে।

আমলকি :

আমলকি একটি অবহেলিত কিন্তু মূল্যবান ফল। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও সিলেট এলাকায় আমলকির চাষ বেশি হয়। আমলকি ভিটামিন ‘সি’ ও ‘ক্যালসিয়াম’ সমৃদ্ধ ফল। এ ফলে যে পরিমাণ ভিটামিন ‘সি’ আছে অন্য কোন ফলে তা নেই। জনসাধারণের ভিটামিন ‘সি’ এর ঘাটতি বিবেচনা

করে এ ফলের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া উচিত। দেশের প্রতিটি বসতবাড়িতে একটি আমলকি গাছ থাকা আবশ্যক। আমলকি চাষাবাদের মাধ্যমে দৈনন্দিন ভিটামিন ‘সি’ এর চাহিদা মেটানো সম্ভব। তাই এ ফলের বাণিজ্যিক চাষের গুরুত্ব রয়েছে।

মাটি ও জলবায়ু :

আমলকি গ্রীষ্ম ও অব-গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় অঞ্চলের ফল। এর জন্য নাতি দীর্ঘ ঠাণ্ডা, শুষ্ক তুষারপাতমুক্ত

শীতকাল, উচ্চ বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা বিশিষ্ট দীর্ঘ উষ্ণ শীতকাল প্রয়োজন। আমলকি একটি কষ্ট সহিষ্ণু উদ্ভিদ। জলবায়ু কিছুটা শুষ্ক হলেও গাছের কোন ক্ষতি হয়না। সুনিষ্কাশিত সব ধরনের মাটিতেই আমলকির চাষ করা যায়। তবে চুন সমৃদ্ধ দোআঁশ মাটিতে আমলকি ভাল হয়।

পুষ্টিমান ও ঔষধি গুণ:

আমলকির ফল টাটকা অবস্থাতেই খাওয়া হয়। আমলকির রস যকৃত, পেটের পীড়া, হাঁপানি, কাশি, বহুমুত্র, অজীর্ণ ও জ্বর রোগে বিশেষ উপকারী। পাতার রস আমাশয় প্রতিষেধক ও বল বর্ধক।

আমলকি রসের শরবত জন্ডিস, বদহজম ও কাশির জন্য উপকারী। ইউনানী শাস্ত্রে ঔষধ তৈরিতে আমলকির ব্যবহার প্রচলিত আছে। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম আমলকিতে রয়েছে (জলীয় অংশ ৯১.৪%), খনিজ ০.৭ গ্রাম, আঁশ ৩.৪ গ্রাম, আমিষ ০.৯ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, শর্করা ৩.৫ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩৪ মিলিগ্রাম, লৌহ ১.২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন ‘বি-১’ ০.০২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন ‘বি-২’ ০.০৮ মিলিগ্রাম, ভিটামিন ‘সি’ ৪৬৩ মিলিগ্রাম এবং খাদ্যশক্তি ১৯ কিলো-ক্যালরি।

আমলকির জাত:

বারি আমলকি-১:

উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ বড়, খাড়া ও অল্প ঝোপালো। পৌষ ও বৈশাখ মাসে গাছে ফুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠ ও অগ্রহায়ণ মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল বড় (৩০ গ্রাম),

চ্যাপ্টা, ও হালকা সবুজ। শাঁস সাদা, মধ্যম রসালো, কচকচে, অল্প কষ্টিভাব সম্বলিত এবং সুস্বাদু (টিএসএস ১২.০)। উচ্চ ভিটামিন ‘সি’ সমৃদ্ধ। ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯২%। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৬.৪ টন। সমগ্র দেশে চাষোপযোগী।

বংশ বিস্তার:

যৌন ও অযৌন উভয় পদ্ধতিতেই আমলকির বংশ বিস্তার করা যায়। বীজ থেকে উৎপাদিত চারায় মাতৃ

গাছের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে না এবং গাছের বৃদ্ধি ধীর গতি সম্পন্ন হয়। এজন্য কলমের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা ভাল। কলমের গাছে দ্রুত ফল ধরে। কলম করার জন্য আমলকির বীজ থেকে উৎপাদিত চারা আদি-জোড় এবং উন্নতমানের গাছের শাখা উপ-জোড় হিসেবে ব্যাবহার করা হয়। ফেব্রুয়ারি, মে-জুন এবং অক্টোবর মাসে ১৩ থেকে ১৪ মাস বয়সের চারার সাথে এক থেকে দেড় মাস বয়স্ক আমলকির ডাল ফাটল কলম পদ্ধতিতে জোড়া লাগাতে হবে। কলম করার পর উপ-জোড়ের শুকিয়ে যাওয়া রোধ করার জন্য পলিথিন কাগজের ঢাকনা দিতে হবে। কলম টিকে গেলে ঢাকনা খুলে দিতে হবে। কলমটি নার্সারিতে স্থাপনের পর পানি সেচ, আগাছা দমন, সার প্রয়োগ এবং জোড়স্থানের নিচ থেকে গজানো কুঁশি ভাঙ্গাসহ অন্যান্য পরিচর্যা সঠিকভাবে করতে হবে। এভাবে উৎপাদিত রোগমুক্ত ১.০-১.৫ বছর বয়সী কলমের চারাকে রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

উৎপাদন প্রযুক্তি:

জমি তৈরি:

আমলকির জন্য সুনিষ্কাশিত এবং মাঝারী বা উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। বাগান আকারে চাষ করতে

হলে নির্বাচিত জমি ভাল করে চাষ ও মই দিয়ে সমতল এবং আগাছামুক্ত করতে হবে।

রোপণের সময় :

বর্ষার শুরুতে অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস গাছ রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে বর্ষার শেষে অর্থাৎ

ভাদ্র-আশ্বিন মাসে গাছ লাগানো যায়। অতিরিক্ত বর্ষায় চারা রোপণ না করাই ভাল।

গর্ত তৈরি: রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৭ X৭ মিটার দূরত্বে ১ X ১ X ১ মিটার আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১০-১৫ কেজি জৈব সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি ও ২০০ গ্রাম জিপসাম সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি ও চারা রোপণ:

সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা আয়তকার কিংবা ত্রিভুজাকার প্রণালীতে আমলকির চারা লাগানো যেতে পারে। কিন্তু উঁচু নিচু পাহাড়ী এলাকায় কন্টুর রোপণ প্রণালী অবলম্বন করতে হবে। গর্ত ভর্তি করার ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে নির্বাচিত চারাটা সোজাভাবে লাগিয়ে তারপর চারদিকে মাটি দিয়ে চেপে দিতে হবে এবং লাগানোর পর পরই বাঁশের খুঁটি, বেড়া ও পানি সেচ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ:

আমলকি গাছে আশানুরূপ গুণগত মানসম্পন্ন ফল পেতে চাইলে নিয়মিত সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। নিম্নের ছকে বয়স ভিত্তিক সারের পরিমাণ দেয়া হলো:

গাছের বয়স ১ থেকে ২ বছর হলে প্রতি গাছে ৫ থেকে ১০ কেজি জৈব সার, ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম এমওপি এবং ৫০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করা হয়। ৩ থেকে ৫ বছর বয়সী গাছের জন্য ১০ থেকে ১৫ কেজি জৈব সার, ৩০০ থেকে ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০ থেকে ৩০০ গ্রাম টিএসপি, ২০০ থেকে ৩০০ গ্রাম এমওপি এবং ১০০ গ্রাম জিপসাম দেওয়া উচিত। ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী গাছের জন্য ১৫ থেকে ২০ কেজি জৈব সার, ৪০০ থেকে ৭০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ থেকে ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ৩০০ থেকে ৫০০ গ্রাম এমওপি এবং ২০০ গ্রাম জিপসাম প্রযোজ্য। ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সী গাছের জন্য প্রয়োজন হয় ২০ থেকে ২৫ কেজি জৈব সার, ৮০০ থেকে ১০০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ থেকে ৮০০ গ্রাম টিএসপি, ৫০০ থেকে ৮০০ গ্রাম এমওপি এবং ৪০০ গ্রাম জিপসাম। ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে গাছের জন্য ৩০ থেকে ৪০ কেজি জৈব সার, ১৫০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০০ গ্রাম টিএসপি, ১০০০ গ্রাম এমওপি এবং ৫০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

উল্লিখিত সার সমান দুই ভাগ করে বর্ষার প্রারম্ভে ও শেষে গাছের গোড়া থেকে কিছুটা দূরে যতটুকু জায়গায় দুপুর বেলা ছায়া পড়ে ততটুকু জায়গায় ছিটিয়ে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের পরে প্রয়োজনে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

আগাছা দমন:

আমলকি বাগান সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের তলায় বা চারিদিকে যাতে আগাছা জন্মাতে

না পারে সেজন্য বর্ষার শুরুতে এবং শেষে জমিতে চাষ দিতে হবে অথবা কোদাল দ্বারা কুপিয়ে দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ:

চারা রোপণের প্রথমদিকে প্রয়োজনমতো সেচ দেয়া দরকার। এছাড়া খরা বা শুকনো মৌসুমে পানি সেচ

দেয়া ভালো।

ডাল ছাঁটাইকরণ:

চারা বা কলম রোপণের পর গাছকে সুন্দর একটি কাঠামো দেয়ার জন্য গোড়ার দিকের সমস্ত

ডালপালা ছাঁটাই করে দিতে হবে। এছাড়া বর্ষার শেষে গাছের মরা, রোগাক্রান্ত, ভাঙ্গা ও দুর্বল ডাল পালা ছাঁটাই করতে হবে।

ফল সংগ্রহ:

ডালপালায় ঝাকুনি দিয়ে ফল মাটিতে ফেললে ফল আঘাত প্রাপ্ত হয়ে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তবে গাছের

নিচে জাল ধরে শাখায় ঝাকুনি দিয়েও ফল সংগ্রহ করা যায়। সমস্ত ফল একসাথে পরিপক্ক হয় না। তাই ২/১ দিন পরপর ফল সংগ্রহ করতে হয়। সংগ্রহের সাথে সাথেই ফল বাজারজাত করতে হবে, কেননা সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সংগৃহীত ফলে ভিটামিন ‘সি’ এর পরিমাণ কমতে থাকে।

অন্যান্য পরিচর্যা :

মরিচা রোগ:

এ রোগের আক্রমণে পাতা ও ফলে মরিচা দাগ পড়ে। এতে গাছের ফলন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং ফলের

গুণগতমান বিনষ্ট হয় ও বাজার মূল্য কমে যায়।

প্রতিকার:

প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ইন্ডোফিল এম-৪৫ মিশিয়ে স্প্রে করলে এ রোগ দমন করা যায়।

আঁশফল:

আঁশফল আমাদের দেশে একটি বিদেশি ফল। আঁশফল লিচু পরিবারভুক্ত একটি ফল। স্বাদে, গন্ধে, পুষ্টিতে লিচুর সমতুল্য হওয়া সত্ত্বেও ফলটি এ দেশে তেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে আঁশফল বেশ জনপ্রিয়। উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন জাত না থাকায় ফলটি সর্বমহলে তেমন পরিচিত হয়ে ওঠেনি। ফল আকারে ছোট এবং খেতে সুস্বাদু। দেশের সর্বত্রই এর চাষ সম্ভব। আঁশফলে প্রচুর পরিমাণে শর্করা ও ভিটামিন ‘সি’ রয়েছে।

আঁশফলের জাত :

বারি আঁশফল-১:

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৯৭ সালে ‘বারি আঁশফল-১’ জাতটি আমাদের দেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। এটি একটি বহু বর্ষজীবী বৃক্ষ। উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ

মাঝারী খাড়া প্রকৃতির ও মধ্যম ঝোপালো। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল আসে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল ছোট (গড় ওজন ৩.৫ গ্রাম), গোলাকার, বাদামী রঙের, শাঁস সাদা,

কচকচে এবং স্বাদ খুব মিষ্টি (টিএসএস ২০-২৫%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৫-৬০%। বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষ যোগ্য। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩-৪ টন। ফুল আসে মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র (মার্চ) মাসে

এবং মধ্য-শ্রাবণ থেকে মধ্য-ভাদ্র (আগস্ট) মাসে ফল পাকে। জাতটি দেশের সর্বত্রই ভাল জন্মে।

বারি আঁশফল-২ :

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ফল বিভাগ ‘বারি আঁশফল-২’ নামে আঁশফলের একটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। নিয়মিত ফলধারী জাতটি বিদেশ থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করে ২০০৯ সালে মুক্তায়ন করা হয়। ফল গোলাকৃতির, বেশ

বড় (৯ গ্রাম), শাঁস সাদা, আংশিক কচকচে, রসালো, খুব মিষ্টি (টিএসএস ২৫%)। বীজ ছোট, খোসা পাতলা, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭৩%। দেশের মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে চাষোপযোগী জাতটি ফলের আহরণ মৌসুম দীর্ঘায়িত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

উৎপাদন প্রযুক্তি:

জমি নির্বাচন:

আঁশফল চাষের জন্য দোআঁশ মাটি উত্তম।

চারা উৎপাদন:

গ্রাফটিং ও গুটি কলমের মাধ্যমে চারা তৈরি করা যায়।

গর্ত তৈরি:

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৫ X ৫ মিটার দূরত্বে ১ X ১ X ১ মিটার আকারের গর্ত করতে হবে।

গর্তের উপরের মাটির সাথে ১৫-২০ কেজি জৈব সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে।

চারা রোপণ:

বাগানে রোপণের দূরত্ব ৫ X ৫ মিটার রাখতে হবে। এ হিসেবে হেক্টরপ্রতি চারা লাগবে ৪০০টি।

সারের পরিমাণ:

গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চ ফলন পেতে হলে আঁশফলে নিয়মিত সার প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। গাছের

বয়স বাড়ার সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। নিম্নের ছকে গাছের বয়স ভিত্তিক সারের পরিমাণ দেয়া হলো।

গাছের বয়স ১ থেকে ২ বছর হলে প্রতি গাছে ৫ থেকে ১০ কেজি জৈব সার, ১৫০ থেকে ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ১৫০ গ্রাম টিএসপি, ১৫০ গ্রাম এমওপি এবং ৫০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করা হয়। ৩ থেকে ৪ বছর বয়সী গাছের জন্য ১০ থেকে ১৫ কেজি জৈব সার, ৩০০ থেকে ৪৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ থেকে ৪৫০ গ্রাম টিএসপি, ৩০০ থেকে ৪৫০ গ্রাম এমওপি এবং ১০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োজন হয়। ৫ থেকে ৬ বছর বয়সী গাছের জন্য ১৫ থেকে ২০ কেজি জৈব সার, ৫০০ থেকে ৬০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৪৫০ থেকে ৬০০ গ্রাম টিএসপি, ৪৫০ থেকে ৬০০ গ্রাম এমওপি এবং ২০০ গ্রাম জিপসাম ব্যবহার করা উচিত। ৭ থেকে ১০ বছর বয়সী গাছের জন্য ২০ থেকে ২৫ কেজি জৈব সার, ৭৫০ থেকে ১০০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৬০০ থেকে ৭৫০ গ্রাম টিএসপি, ৬০০ থেকে ৭৫০ গ্রাম এমওপি এবং ৩০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করা হয়। ১১ বছর বা তার বেশি বয়সী গাছের জন্য ২৫ থেকে ৩০ কেজি জৈব সার, ১০০০ থেকে ১২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৭৫০ থেকে ৯০০ গ্রাম টিএসপি, ৭৫০ থেকে ৯০০ গ্রাম এমওপি এবং ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করা হয়।

উল্লিখিত সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম বার ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মুকুল আসার পর ২য় বার জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজের রং ধারণ পর্যায়ে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল সংগ্রহের পর ৩য় বার সার প্রয়োগ করতে হয়।

সেচ প্রয়োগ:

খরার সময় পানি সেচের প্রয়োজন হয়। অতিবৃষ্টির সময় পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

রাম্বুতান:

রাম্বুতান আকর্ষণীয়, অত্যন্ত সুস্বাদু ও রসালো ফল। সাদা, স্বচ্ছ, মিষ্টি স্বাদ ও গন্ধযুক্ত শাঁস এ ফলের ভক্ষণীয় অংশ। গায়ে লাল ও নরম কাঁটা থাকার কারণে এদের লিচু থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখায়। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতেই এদের উৎপত্তিস্থল এবং দক্ষিণ চীন, ইন্দোচীন ও ফিলিপাইন পর্যন্ত এটি বিস্তৃত।বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহ (যেখানে শীতের প্রকোপ তুলনামূলকভাবে কম) রাম্বুতান চাষের জন্য অধিক উপযোগী।

পুষ্টিমান :

রাম্বুতান ‘শর্করা’ ও ভিটামিন ‘সি’ সমৃদ্ধ একটি ফল। আহার উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম ফলে (জলীয় অংশ ৮২.১%, প্রোটিন ০.৯%, ফ্যাট ০.১%, ০.০৩% আঁশ, ০.০৫% ম্যালিক এসিড, ০.৩১% সাইট্রিক এসিড), ২.৮ গ্রাম গ্লকোজ, ৩.০ গ্রাম ফ্রুকটোজ, ৯.৯ গ্রাম সুক্রোজ, ২.৮ গ্রাম ফাইবার, ৭০ মিলি গ্রাম ভিটামিন সি, ১৫ মিলি গ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.১-২.৫ মিলি গ্রাম লৌহ, ১৪০ মিলি গ্রাম পটাসিয়াম, ও ১০ মিলি গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়।

রাম্বুতানের জাত :

বারি রাম্বুতান-১:

বিদেশ হতে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাতটি ২০১০ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য ‘বারি রাম্বুতান-১’ নামে অনুমোদন দেয়া হয়। নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ বড় ও ঝোপালো। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল আসে, চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফল

ধরে। শ্রাবণ মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়, ফল ডিম্বাকৃতির, আকারে বড় (৫০ গ্রাম)। পাকা ফলের রং আকর্ষণীয় লালচে খয়েরি। ফলের গায়ের কাঁটা (স্পাইনলেট) বেশ লম্বা ও নরম। শাঁস পুরুত্ব, মাংসল, সাদা, নরম, রসালো সুগন্ধযুক্ত এবং মিষ্টি (টিএসএস ১৯%)। বীজ ছোট ও নরম, খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৮%। বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ টন।

জলবায়ু ও মাটি:

রাম্বুতান উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু পছন্দ করে। রাম্বুতান ফলের গাছ ২২-৩৫০ সে. তাপমাত্রা ও ২০০০

থেকে ৩০০০ মিমি বার্ষিক বৃষ্টিপাত পছন্দ করে। এঁটেল দোঁআশ মাটি রাম্বুতান চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। তবে ঊর্বর, সুনিষ্কাশিত পলিমাটি ও দোআঁশ মাটিতেও রাম্বুতান সাফল্যজনকভাবে চাষ করা যায়। সুনিষ্কাশিত উচ্চ জৈব পদার্থ সম্বলিত মাটিতে গাছের মূলের বৃদ্ধি ও বিকাশ ভাল হয়। মাটির অম্ল/ক্ষারত্ব (pH ৫.০-৬.৫) রাম্বুতানের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। রাম্বুতান স্বল্পমেয়াদী জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারলেও দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতায় গাছ মারা যায়।

বংশ বিস্তার:

অঙ্গজ উপায়ে অথবা বীজের মাধ্যমে রাম্বুতানের বংশ বিস্তার হয়ে থাকলেও মাতৃ গুণাগুণ বজায় রাখার

জন্য অঙ্গজ উপায়ে বংশ বিস্তার উত্তম। কুঁড়ি সংযোজন ও গুটিকলম পদ্ধতিতে রাম্বুতানের বংশ বিস্তার করা হয়। ১-২ বৎসর বয়সী শাখা থেকে সুপ্ত কুঁড়ি সংগ্রহ করে ৮-১২ মাস বয়সের রুটস্টক সংযোজন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া গুটি কলম পদ্ধতিতে সফলতার হার বেশি এবং শ্রমসাধ্য। ১০০০-১৫০০ পিপিএম ঘনত্বের আইবিএ ব্যবহার করে গুটি কলমের মাধ্যমেও সফলভাবে রাম্বুতানের বংশ বিস্তার করা যায়।

জমি তৈরি:

রাম্বুতানের জন্য সুনিষ্কাশিত উঁচু ও মাঝারী উঁচু ঊর্বর জমি নির্বাচন করতে হবে। পর্যায়ক্রমিক কয়েকটি

চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে নিতে হবে। মাদা তৈরির পূর্বে জমি থেকে বহুবর্ষজীবী আগাছা বিশেষ করে উলুঘাস সমূলে অপসারণ করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি:

সমতল ভূমিতে বর্গাকার কিংবা ষড়ভুজাকার এবং পাহাড়ী জমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে কলম রোপণ

করতে হবে। কলম রোপণের পর হালকা ও অস্থায়ী ছায়ার ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো।

রোপণের সময়:

মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-অক্টোবর কলম রোপণের উপযুক্ত সময়।

মাদা তৈরি:

উভয় দিকে ৮-১০ মিটার দূরত্বে ১ X ১ X১ মিটার আকারের গর্ত করে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখতে হবে।

কলম রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে প্রতি গর্তে ২৫-৩০ কেজি পচা গোবর, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ৩০০ গ্রাম এমওপি, ২০০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। মাটিতে রসের অভাব থাকলে পানি সেচ দিতে হবে।

চারা রোপণ:

গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারাটি সোজাভাবে গর্তের মাঝখানে লাগিয়ে কলমের চারদিকের

মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হবে এবং খুঁটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে যাতে বাতাসে চারার গোড়া নড়ে না যায়। রোপণের পরপরই পানি সেচ দিতে হবে। এরপর নিয়মিত পানি সেচ ও প্রয়োজনে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ:

বয়স বাড়ার সাথে সাথে গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যক।

বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিম্নরূপ:

গাছের বয়স ১ থেকে ২ বছর হলে প্রতি গাছে ১০ থেকে ১৫ কেজি গোবর সার, ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ১৫০ গ্রাম এমওপি প্রয়োগ করা হয়। ২ থেকে ৪ বছর বয়সী গাছের জন্য প্রয়োজন হয় ১৫ থেকে ২০ কেজি গোবর সার, ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৪৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ৩০০ গ্রাম এমওপি। ৫ থেকে ৭ বছর বয়সী গাছের জন্য ২০ থেকে ২৫ কেজি গোবর সার, ৪৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৭৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ৪৫০ গ্রাম এমওপি ব্যবহার করা হয়। ৮ থেকে ১০ বছর বয়সী গাছের জন্য ২৫ থেকে ৩০ কেজি গোবর সার, ৭৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ১২০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৬০০ গ্রাম এমওপি প্রয়োগ করা হয়। ১০ থেকে ১৫ বছর বয়সী গাছের জন্য ৩০ থেকে ৪০ কেজি গোবর সার, ১২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১৫০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৭৫০ গ্রাম এমওপি প্রয়োজন হয়। ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে গাছের জন্য ৪০ থেকে ৫০ কেজি গোবর সার, ১৫০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১০০০ গ্রাম এমওপি প্রয়োগ করা উচিত।

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি ফল আহরণের পর (ভাদ্র মাসে), দ্বিতীয় কিস্তি শীতের প্রারম্ভে (কার্তিক মাসে) এবং শেষ কিস্তি গাছে ফল আসার পর (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে) প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে সার প্রয়োগের পর সেচ প্রদান করতে হবে।

আগাছা দমন:

গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমিকে আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন। বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে কোদাল

দ্বারা কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে আগাছা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন:

রাম্বুতান গাছ খরা সংবেদনশীল। চারার বৃদ্ধির জন্য শুকনো মৌসুমে ১০-১৫ দিন পরপর সেচ

দিতে হবে। ফলন্ত গাছের বেলায় সম্পূর্ণ ফুল ফোটা পর্যায়ে একবার, ফল মটর দানার মতো হলে একবার এবং এর ১৫ দিন পর আরও একবার মোট তিনবার সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। সার প্রয়োগের পর সেচ দেয়া ভাল। বর্ষার সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি না জমে তার জন্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া ফুল আসার ৬-৮ সপ্তাহ আগে সামান্য পানির কষ্ট/পীড়ন দিলে আগাম ও অধিক ফুল ফুটতে দেখা যায়।

ডাল ও মুকুল ছাঁটাইকরণ:

রাম্বুতান গাছকে সধারণত লম্বা ও খাড়াভাবে বাড়তে দেখা যায়। তাই প্রথম দিকেই গাছের

সঠিকভাবে প্রুনিং করা জরুরি। ফল সংগ্রহের পরপর ফলের বোটা গোড়া থেকে কেটে দিতে হবে তাতে গাছের নতুন কুঁড়িগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। মৃত, রোগাক্রান্ত এবং লকলকে ডালপালাগুলো নিয়মিত অপসারণ করতে হবে। কলমের ক্ষেত্রে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রথম ৩-৪ বছর পর্যন্ত মুকুল আসলে তা কেটে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ :

সাধারণত ফল ও স্পাইনলেটের রং লালচে বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হবে। অপরিপক্ক ফলে

মিষ্টতা ও অন্যান্য গুণাবলী পরিপক্ক ফলের তুলনায় অনেক কম থাকে। ভাল বাজার মূল্য পাওয়ার জন্য ফল লালচে খয়েরী বর্ণ ধারণ করার ১০-১২ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা ভাল। গাছে ফল অতিরিক্ত পাকিয়ে সংগ্রহ করলে এরিল শুকিয়ে শক্ত হয় এবং ফলের সুগন্ধ ও স্বাদ কমে যায়।

স্ট্রবেরি :

স্ট্রবেরি একটি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। মৃদু শীত প্রধান দেশে এটি স্বল্প মেয়াদী ফল হিসেবে চাষ হয়। আকর্ষণীয় রং, গন্ধ ও উচ্চ পুষ্টিমানের জন্য স্ট্রবেরি অত্যন্ত সমাদৃত। এতে প্রচুর ভিটামিন ‘সি’ ছাড়াও পর্যাপ্ত পরিমাণে অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। ফল হিসেবে সরাসরি খাওয়া ছাড়াও বিভিন্ন খাদ্যের সৌন্দর্য ও সুগন্ধ বৃদ্ধিতেও স্ট্রবেরি ব্যবহৃত হয়।

স্ট্রবেরির জাত:

বারি স্ট্রবেরি-১:

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ‘বারি স্ট্রবেরি-১’ নামে একটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। জাতটি ২০০৮ সালে অবমুক্ত করা হয়। বাংলাদেশে সর্বত্র চাষোপযোগী একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছের গড় উচ্চতা ৩০ সেমি এবং বিস্তার ৪৫-৫০ সেমি। নভেম্বরের মাঝামাঝী সময়ে গাছে ফুল আসতে শুরু করে এবং ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। গাছপ্রতি গড়ে ৩২টি ফল ধরে যার মোট গড় ওজন ৪৫০ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ টন।হৃৎপিণ্ডাকৃতির ফল ক্ষুদ্র থেকে মধ্যম আকারের যার গড় ওজন ১৪ গ্রাম। পাকা ফল আকর্ষণীয় টকটকে লাল বর্ণের। ফলের ত্বক নরম ও ঈষৎ খসখসে। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। স্ট্রবেরির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুগন্ধযুক্ত ফলের স্বাদ টক-মিষ্টি (টিএসএস-১২%)। জাতটি পর্যাপ্ত সরু লতা ও চারা উৎপাদন করে বিধায় এর বংশ বিস্তার সহজ।

বারি স্ট্রবেরি-২

বাংলাদেশের সর্বত্র চাষোপযোগী একাট উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছপ্রতি গড়ে ৩৭টি ফল ধরে যার মোট গড় ওজন ৭৪১ গ্রাম। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। মধ্য ডিসেম্বর থেকে মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়। ফল দেখতে আকর্ষণীয় গাঢ় লাল রঙের, তুলনামূলক দৃঢ়, আকারে বেশ বড়, প্রান্তভাগ চ্যাপ্টা, রসালো, সুগন্ধযুক্ত এবং মিষ্টি (টিএসএস ৮%)। ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি’ বিদ্যমান (৭৬ মি. গ্রা./১০০ গ্রাম)। ফল ২-৩ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি পর্যাপ্ত সরুলতা (রানার) ও চারা উৎপাদন করে বিধায় এর বংশবিস্তার সহজ। বারি স্ট্রবেরি-৩ বাংলাদেশের সর্বত্র চাষোপযোগী একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ প্রতি গড়ে ৩৯ টি ফল ধরে যার মোট গড় ওজন ৭৭০ গ্রাম। ফলের শতভাগ

ভক্ষণযোগ্য। ফল দেখতে আকর্ষণীয় লাল রঙের, লম্বা মোচাকৃতি, আকারে বেশ বড়, ফল তুলানামূলক দৃঢ়, প্রান্তভাগ সরু, রসালো, সুগন্ধযুক্ত এবং মিষ্টি। ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি’ বিদ্যমান (৭২ মি. গ্রা./১০০ গ্রাম)। ফল ২-৩ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা ডায়।জাতটি পর্যাপ্ত সরু লতা (রানার) ও চারা উৎপাদন করে বিধায় এর বংশ বিস্তার সহজ।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও আবহাওয়া:

স্ট্রবেরি মূলত মৃদু শীত প্রধান অঞ্চলের ফসল। কিন্তু গ্রীষ্মায়িত জাত কিছুটা তাপ সহিষ্ণু। দিন ও

রাতে যথাক্রমে ২০-২৬০ ও ১২-১৬০ সে. তাপমাত্রা গ্রীষ্মায়িত জাতসমূহের জন্য প্রয়োজন। ফুল ও ফল আসার সময় শুষ্ক আবহাওয়া আবশ্যক। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় রবি মৌসুম স্ট্রবেরি চাষের উপযোগী। বৃষ্টির পানি জমে না এ ধরনের ঊর্বর দোআঁশ থেকে বেলে-দোআঁশ মাটি স্ট্রবেরি চাষের জন্য উত্তম।

চারা উৎপাদন:

স্ট্রবেরি রানারের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে থাকে। তাই পূর্ববর্তী বছরের গাছ নষ্ট না করে জমি থেকে তুলে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ হালকা ছায়াযুক্ত স্থানে রোপণ করতে হবে। উক্ত গাছ হতে উৎপন্ন রানারে যখন শিকড় বের হবে তখন তা কেটে ৫০ ভাগ গোবর ও ৫০ ভাগ পলিমাটিযুক্ত পলিথিন ব্যাগে লাগাতে হবে এবং হালকা ছায়াযুক্ত নার্সারিতে সংরক্ষণ করতে হবে। অতিরিক্ত বৃষ্টির হাত হতে চারাকে রক্ষার জন্য বৃষ্টির মৌসুমে চারার উপর পলিথিনের ছাউনি দিতে হবে। রানারের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হলে স্ট্রবেরির ফলন ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। তাই জাতের ফলন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত চারা ব্যবহার করা উত্তম।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ:

স্ট্রবেরি উৎপাদনের জন্য কয়েকবার চাষ ও মই দিয়ে উত্তমরূপে জমি তৈরি করতে হবে।

চারা রোপণের জন্য বেড পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এ জন্য ১ মিটার প্রশস্ত এবং ১৫-২০ সেমি উঁচু বেড তৈরি করতে হবে। দুটি বেডের মাঝে ৪০-৫০ সেমি নালা রাখতে হবে। প্রতি বেডে ৫০-৬০ সেমি দূরত্বে দুই সারিতে ৩০-৪০ সেমি দূরে দূরে চারা রোপণ করতে হবে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় আশ্বিন মাস (মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-অক্টোবর) স্ট্রবেরির চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়।

সার প্রয়োগ:

গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চফলন পেতে হলে স্ট্রবেরির জমিতে হেক্টরপ্রতি নিম্নলিখিত পরিমাণ সার প্রয়োগ

করতে হবে।

সারের নাম হেক্টরপ্রতি পরিমাণ

পচা গোবর : ৩০ (টন)

ইউরিয়া : ২৫০ (কেজি)

টিএসপি : ২০০ (কেজি)

এমওপি : ২২০ (কেজি)

জিপসাম : ১৫০ (কেজি)

শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম ও অর্ধেক পরিমাণ এমওপি সার জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে

ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও অবশিষ্ট এমওপি সার চারা রোপণের ১৫ দিন পর থেকে ১৫-২০ দিন অন্তর ৪-৫ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ ও নিষ্কাশন:

জমিতে রসের অভাব দেখা দিলে প্রয়োজন মতো পানি সেচ দিতে হবে। স্ট্রবেরি জলাবদ্ধতা মোটেই

সহ্য করতে পারে না। তাই বৃষ্টি বা সেচের অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা:

সরাসরি মাটির সংস্পর্শে এলে স্ট্রবেরির ফল পচে নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য চারা রোপণের

২০-২৫ দিন পর স্ট্রবেরির বেড খড় বা কাল পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খড়ে যাতে উঁই পোকার আক্রমণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতি লিটার পানির সাথে ৩ মিলি ডার্সবান-২০ ইসি ও ২ গ্রাম অটোস্টিন ডিএফ মিশিয়ে ঐ দ্রবণে খড় শোধন করে নিলে তাতে উঁই পোকার আক্রমণ হয় না এবং দীর্ঘ দিন তা অবিকৃত থাকে। জমি সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের গোড়া হতে নিয়মিতভাবে রানার বের হয়। উক্ত রানারসমূহ ১০/১৫ দিন পর পর কেটে ফেলতে হবে। রানার কেটে না ফেললে গাছের উৎপাদন হ্রাস পায়।

ফল সংগ্রহ:

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝী (অক্টোবরের শুরু) সময়ে রোপণকৃত বারি স্ট্রবেরি-১ এর ফল সংগ্রহ পৌষ মাসে শুরু হয়ে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত চলে। ফল পেকে লাল বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হয়। স্ট্রবেরির সংরক্ষণ কাল খুবই কম বিধায় ফল সংগ্রহের পর পরই তা টিস্যু পেপার দিয়ে মুড়িয়ে প্লাস্টিকের ঝুড়ি বা ডিমের ট্রেতে এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে ফল গাদাগাদি অবস্থায় না থাকে। ফল সংগ্রহের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজারজাত করতে হবে। স্ট্রবেরির সংরক্ষণ গুণ ও পরিবহন সহিষ্ণুতা কম হওয়ায় বড় বড় শহরের কাছাকাছি এর চাষ করা উত্তম। হেক্টরপ্রতি ৩৫-৪০ হাজার চারা রোপণ করা যায়। প্রতি গাছে ২৫০-৩০০ গ্রাম হিসেবে ‘বারি স্ট্রবেরি-১’ এর ফলন হেক্টরপ্রতি ১০-১২ টন।

মাতৃ গাছ রক্ষণাবেক্ষণ:

স্ট্রবেরি গাছ প্রখর সৌর-তাপ এবং ভারী বর্ষণ সহ্য করতে পারে না। এজন্য মার্চ-এপ্রিল মাসে হালকা ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা ফল আহরণের পর মাতৃ গাছ তুলে টবে রোপণ করে ছায়ায় রাখতে হবে। ফল আহরণ শেষ হওয়ার পর সুস্থ-সবল গাছ তুলে পলিথিন ছাউনির নিচে রোপণ করলে মাতৃ গাছকে খরতাপ ও ভারী বর্ষণের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা য়ায়। মাতৃ গাছ থেকে উৎপাদিত রানার পরবর্তী সময়ে চারা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা

পাতায় দাগ পড়া রোগ

কোন কোন সময় ছত্রাকজনিত রোগের পাতায় বাদামী রঙের দাগ পরিলক্ষিত হয়। এ রোগের আক্রমণ হলে ফলন এবং ফলের গুণগত মান হ্রাস পায়।

প্রতিকার

সিকিউর নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার ¯স্প্রে করে সুফল পাওয়া যায়।

ফল পচা রোগ

এ রোগের আক্রমণে ফলের গায়ে জলে ভেজা বাদামী বা কালো দাগের সৃষ্টি হয়। দাগ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ফল খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়।

প্রতিকার

ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে নোইন ৫০ ডব্লিওপি অথবা অটোস্টিন নামক ছত্রাকনাশক

প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৮-১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে

হবে।

ভারটিসিলাম উইল্ট রোগ

এ রোগে আক্রান্ত গাছ হঠাৎ করে দুর্বল ও বিবর্ণ হয়ে পড়ে। আক্রমণ বেশি হলে গাছ বাদামী বর্ণ ধারণ করে এবং মারা যায়। সাধারণত জলাবদ্ধতাসম্পন্ন জমিতে এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়।

প্রতিকার

জমি শুষ্ক রাখতে হবে। পলিথিন মাল্চ ব্যবহার করলে তা তুলে ফেলতে হবে। কপার জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন- বর্দোমিক্সার (১:১:১০) ৮-১০ দিন পরপর ২-৩ বার গাছের গোড়া ও মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে ।

পাখি

বুলবুলি পাখি স্ট্রবেরির সবচেয়ে বড় শত্রু। ফল আসার পর সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই পাখির উপদ্রব শুরু হয়।

প্রতিকার

ফল আসার পর সম্পূর্ণ বেড জাল দ্বারা ঢেকে দিতে হবে যাতে পাখি ফল খেতে না পারে।

ভাইরাস

ভাইরাস রোগের আক্রমণে স্ট্রবেরির ফলন ক্ষমতা এবং গুণগত মান হ্রাস পেতে থাকে। সাদা মাছি এ ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

প্রতিকার

এডমায়ার ২০০ এসএল নামক কীটনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ০.২৫ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করে সাদা মাছি দমন করলে ভাইরাস রোগের বিস্তার রোধ করা যায়।

মাইট

মাইটের আক্রমণে স্ট্রবেরির ফলন ক্ষমতা ও গুণগত মান মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। এদের আক্রমণে পাতা তামাটে বর্ণ ধারণ করে ও পুরু হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে কুচকে যায়। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়।

প্রতিকার

ভারটিমেক ১৮ ইসি নামক মাকড়নাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার ¯স্প্রকরতে হবে।

বিলাতি গাব

বিলাতি গাব একটি বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের সুন্দর ও সুস্বাদু ফলগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, পিরোজপুর এবং পাহাড়ী এলাকায় বিলাতী

গাব গাছ দেখা যায়। বিলাতি গাবের গাছ মাঝারী থেকে উঁচু বৃক্ষ, ফল গোলাকার। বিলাতি গাব অনেকেই যত্ন সহকারে লাগিয়ে থাকেন। ফল হিসেবে দেশের সব এলাকায় এটি সমভাবে পরিচিত নয়। এর স্বাদ গন্ধ

ও পুষ্টিমান সম্পর্কে সর্বমহলে ধারণার অভাব থাকায় সম্ভাবনাময় এ ফলটি তেমন বিস্তার লাভ করেনি। বিলাতি গাবের ত্বক রেশমী লোমে আবৃত, রং বাদামী থেকে উজ্জ্বল লাল। ফলের শাঁস সাদাটে, আঠালো ও

সুস্বাদু। পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা গাছে হয়।

বিলাতি গাবের জাত

বারি বিলাতি গাব-১

দেশিয় জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে দীর্ঘদিন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ‘বারি বিলাতি গাব-১’ নামক জাতটি নির্বাচন করা হয়। সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ২০১১ সালে জাতটি অনুমোদন করা হয়। নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ খাড়া, চির সবুজ ও অত্যধিক ঝোপালো। মাঘ-ফাল্গুন মাসে গাছে ফুল আসে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। গাছপ্রতি ৩৭২টি ফল ধরে যার ওজন ১২১কেজি। ফল বড় (৩২৫ গ্রাম), গোলাকার ও আকর্ষণীয় উজ্জ্বল লাল বর্ণের। ফলের শাঁস ধূসর বর্ণের, আঠালো, সুগন্ধযুক্ত এবং মিষ্টি (টিএসএস ১৫%)। ফলপ্রতি ৩-৪টি বীজ থাকে, বীজ ছোট, খোসা পাতলা, খাদ্যোপযোগী অংশ ৭২%। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০-৩৫ টন। দেশের সব এলাকায় চাষযোগ্য।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি:

গ্রীষ্ম ও অব-গ্রীষ্ম মণ্ডলের উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া বিলাতি গাব চাষের জন্য উপযোগী। প্রায়

সব ধরনের মাটিতে বিলাতি গাব গাছ সহজেই হতে পারে, তবে ঊর্বর মাটিতে বিলাতি গাব ভাল হয়। অনুর্বর মাটিতেও বিলাতি গাব ভাল ফলন দিতে সক্ষম। বিলাতি গাব গাছ অত্যন্ত কষ্ট সহিঞ্চু এবং অনেকটা বিনা যত্নেই ভাল ফলন দিয়ে থাকে। এরা যেমন খরা সহ্য করতে পারে তেমনি গোড়ায় দীর্ঘদিন পানি জমে থাকলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

বংশ বিস্তার:

বীজের মাধ্যমে সাধারণত বিলাতি গাবের বংশ বিস্তার করা হয়ে থাকে। বীজাবরণ বেশ শক্ত বিধায়

পরিপক্ক ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করে ২৪-৩০ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে অঙ্কুরোদ্গম ত্বরান্বিত হয়। বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার করা হলে মাতৃ গাছের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থকে না বিধায় অযৌন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করা উত্তম। অঙ্গজ উপায়ে গুটি কলম এবং এক বছর বয়স্ক বিলাতি গাবের চারার উপর ভিনিয়ার/ক্লেফট পদ্ধতিতে সহজেই বিলাতি গাবের কলম করা যায়। বৈশাখ থেকে আষাঢ় মাস কলম করার উপযুক্ত সময়।

রোপণ পদ্ধতি:

সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা ষড়ভুজ প্রণালীতে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু উঁচু নিচু পাহাড়ে কন্টুর রোপণ প্রণালী অনুসরণ করতে হবে। মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বিলাতি গাবের চারা রোপণ করা যায়।

মাদা তৈরি:

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ৬.০ মিটার দূরত্বে ১ X ১ X১ মিটার মাপের গর্ত করতে

হবে। প্রতি গর্তে ১৫-২০ কেজি কম্পোস্ট বা পচা গোবর, ৩-৫ কেজি ছাই, ২০০ গ্রাম টিএসপি এবং ২৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি:

এক বছর বয়সী সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত চারা/কলম রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে। গর্তে সার

প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা/কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগিয়ে তারপর চারদিকে মাটি দিয়ে চারার গোড়ায় মাটি সামান্য চেপে দিতে হবে। রোপণের পরপর খুঁটি দিয়ে চারা/কলমটি খুটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমতো পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ

প্রতিটি গাছের জন্য সারের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে:

গাছের বয়স ১ থেকে ৩ বছর হলে প্রতি গাছে ১০ থেকে ১৫ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ২০০ থেকে ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম এমওপি প্রয়োগ করা হয়। ৪ থেকে ৭ বছর বয়সী গাছের জন্য ১৫ থেকে ২০ কেজি গোবর সার, ৩০০ থেকে ৪৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০ থেকে ৩০০ গ্রাম টিএসপি এবং ২০০ থেকে ৩০০ গ্রাম এমওপি প্রয়োগ করা উচিত। ৮ থেকে ১০ বছর বয়সী গাছের জন্য ২০ থেকে ২৫ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট, ৫০০ থেকে ৮০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ থেকে ৪০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৩০০ থেকে ৪০০ গ্রাম এমওপি প্রয়োজন হয়। ১০ বছরের ঊর্ধ্বে গাছের জন্য ২৫ থেকে ৩০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট, ১০০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৫০০ গ্রাম এমওপি প্রয়োগ করা হয়।

সবটুকু সার তিন ভাগ করে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র-আশ্বিন ও মাঘ-ফাল্গুন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার দেওয়ার পর প্রয়োজনে পানি দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ:

চারা রোপণের প্রথমদিকে প্রয়োজনমতো সেচ দেয়া দরকার। খরা বা শুকনো মৌসুমে পানি সেচ দিলে

ফল ঝরা কমে, ফলন বৃদ্ধি পায় এবং ফলের আকার ও অন্যান্য গুণাগুণ ভাল হয়।

ডাল ছাঁটাইকরণ:

চারা অবস্থায় গাছকে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করে রাখতে হবে।

ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে গাছের মরা, রোগাক্রান্ত ও পোকামাকড় আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিষ্কার করতে হবে।

ফল সংগ্রহ:

শীতের শেষে গাছে ফুল আসে এবং বর্ষার শেষভাগে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল পাকে। ফল পূর্ণতা প্রাপ্তির

সাথে সাথে হালকা লাল থেকে উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে। পরিপক্ক ফল হাত দিয়ে কিংবা জালিযুক্ত বাঁশের কোটা দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়।

কদবেল

বারি কদবেল-১

নিয়মিত প্রচুর ফল প্রদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ মাঝারী, ছড়ানো আকৃতির ঝোপালো। মধ্য বৈশাখ থেকে আষাঢ় মাসে গাছে ফুল আসে এবং কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ফল আহরণ করা যায়। ফল গোলাকৃতির, আকারে বড় এবং পাকা ফল সবুজাভ বাদামী বর্ণের। ফলের শাঁস গাঢ় বাদামী ও মধ্যম রসালো, আঁশের পরিমাণ কম, স্বাদ টক-মিষ্টি (টিএসএস ১৮.৬৭%)। ফলের ওজন ৩৪৪ গ্রাম, খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৯.১৫%। গাছপ্রতি ২০০০-২৫০০টি ফল হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন।

জাতটি দেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী।

বংশ বিস্তার

যৌন ও অযৌন দুই উপায়েই কদবেলের বংশ বিস্তার করা সম্ভব। বাংলাদেশে সাধারণত বীজ দিয়েই কদবেলের বংশ বিস্তার করা হয়। পর-পরাগায়িত বলে বীজের গাছে মাতৃ গাছের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্নœ থাকে না। এজন্য উৎকৃষ্ট জাতের চারা উৎপাদন করতে চাইলে গুটি কলম অথবা কুঁড়ি সংযোজন/জোড় কলম পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। জুন-জুলাই মাসে ১ বা ২ বছরের চারা আদিজোড় হিসেবে ব্যবহার করে এর উপর তালি কলম (চধঃপয নঁফফরহম) অথবা ভিনিয়ার/ফাটল কলমের মাধ্যমে সফলভাবে বংশ বিস্তার করা যায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন ও তৈরি:

পূর্ণ রৌদ্রযুক্ত স্থানে কদবেলের চাষ করা উচিত। কদবেল চাষের জন্য বর্ষার পানি জমে না এমন

জমি নির্বাচন করতে হবে। এর শিকড় মাটির খুব বেশি গভীরে প্রবেশ করে না তাই জমিতে পানির তল খুব বেশি নিচে থাকা ক্ষতিকর। বাগান আকারে কদবেল আবাদের জন্য সমস্ত আগাছা, মোথা ও পুরাতন গাছের গুঁড়ি উপড়ে ফেলতে হবে। উত্তমরূপে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করার পর নির্দিষ্ট স্থানে চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি, রোপণের সময় ও দূরত্ব:

কদবেল গাছ বাগান আকারে করতে চাইলে বর্গাকার পদ্ধতি অনুসরণ করা ভাল। উঁচু নিচু পাহাড়ী এলাকায় কন্টুর রোপণ প্রণালী অবলম্বন করা যেতে পারে। বর্ষার প্রারম্ভে অর্থাৎ বৈশাখ-আষাঢ়

(মে- জুলাই) মাস কদবেলের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। অতিরিক্ত বর্ষায় চারা রোপণ না করা ভাল। তবে বর্ষার শেষের দিকে ভাদ্র-আশ্বিন মাসেও গাছ লাগানো চলে। বাগান আকারে কদবেলের চাষ করতে চাইলে ৬ মিটার X ৬ মিটার দূরত্বে এক বছর বয়সী চারা/কলম রোপণ করা উচিত।

মাদা তৈরি:

চারা/কলম রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ১ মিটারX ১ মিটার X ১ মিটার আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে।

প্রতি গর্তে ১০-১৫ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে সেচ দিতে হবে। মাটিতে সার মিশানোর পূর্বে সম্ভব হলে গর্তের মধ্যে কিছু খড়কুটো ও কাঠের গুঁড়া দিয়ে পুড়িয়ে নিলে উইপোকা ও রোগ জীবাণুর আক্রমণ রোধ হবে।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা:

গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে ঠিক খাড়াভাবে চারা রোপণ করতে

হবে। চারা রোপণের সময় মাটি নিচের দিকে ভালভাবে চাপ দিতে হয় যাতে চারাটি শক্তভাবে দাড়িয়ে থাকতে পারে। চারাটি একটি বা দুটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। গরু ছাগলের উপদ্রব থেকে চারাকে রক্ষার জন্য বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। চারা রোপণের পর প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা নিতে হবে। এমতাবস্থায় মালচিং দিলে খুবই ভাল হয়।

ডাল ছাঁটাইকরণ:

সাধারণভাবে কদবেলের চারা/কলমের মধ্যে ছোট অবস্থায় ঝোপালো হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা

যায়। রোপণের পর গোড়ার দিকে ১.০-১.৫ মিটার পর্যন্ত সমস্ত ডাল ছাঁটাই করতে হবে। এর ওপর থেকে চতুর্দিকে ছড়ানো ৪-৫টি ডাল রেখে দিতে হবে যাতে গাছটির একটি সুন্দর কাঠামো তৈরি হয়। ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের ছোট ছোট ডালপালা ছেটে দেয়া দরকার।

গাছে সার প্রয়োগ:

গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে

সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিচের ছকে দেয়া হল:

গাছের বয়স ১ থেকে ৪ বছর হলে প্রতি গাছে ১০ থেকে ১৫ কেজি গোবর, ১৫০ থেকে ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম টিএসপি, ১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম এমওপি এবং ১০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করা হয়। ৫ থেকে ১০ বছর বয়সী গাছের জন্য ১৫ থেকে ২০ কেজি গোবর, ৪৫০ থেকে ৬০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০ থেকে ৩০০ গ্রাম টিএসপি, ২০০ থেকে ৩০০ গ্রাম এমওপি এবং ২০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করা উচিত। ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সী গাছের জন্য প্রয়োজন হয় ২০ থেকে ৩০ কেজি গোবর, ৬০০ থেকে ৭৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ থেকে ৪৫০ গ্রাম টিএসপি, ৩০০ থেকে ৪৫০ গ্রাম এমওপি এবং ২৫০ গ্রাম জিপসাম। ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে গাছের জন্য ৩০ থেকে ৪০ কেজি গোবর, ১০০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ৫০০ গ্রাম এমওপি এবং ৩০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করা হয়।

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বর্ষার প্রারম্ভে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে), দ্বিতীয় কিস্তি বর্ষার শেষে (ফল আহরণের পর) এবং শেষ কিস্তি শীতের শেষে (মাঘ-ফাল্গুন মাসে) প্রয়োগ করতে হবে। সারগুলো একত্রে মিশিয়ে গাছের চারদিকে (গোড়া থেকে ০.৫-১.০ মিটার জায়গা ছেড়ে দিয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত এলাকা পর্যন্ত) ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর সার ছিটানো জায়গার মাটি কুপিয়ে সারগুলো মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রস না থাকলে সার প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ:

চারা রোপণের পর ঘন ঘন সেচ দেয়া দরকার। খরা বা শুকনো মৌসুমে পানি সেচ দিলে ভাল ফলন

পাওয়া যায়।

ফল সংগ্রহ:

ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসে গাছে ফুল আসে এবং শীতের প্রারম্ভে অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ফল

পাকতে শুরু করে। আমাদের দেশে সাধারণত অপরিপক্ক ফল আহরণ করে কয়েকদিন রোদে রেখে পাকানো হয়। এতে ফলের কাঙ্ক্ষিত স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যায় না এবং অনেক ফল নষ্ট হয়। ফল পরিপক্ক হলে এর ত্বক ধুসর মলিন বর্ণ ধারণ করে এবং ফলের বোঁটা আলগা হয়ে যায়। সামান্য ঝাকুনিতেই ফল ঝরে পড়ে। গাছে ঝাকি দিয়ে ফল আহরণ করা উচিৎ নয়। এতে অনেক ফল বিবর্ণ হয়ে যায় এবং ফেটে নষ্ট হয়।

বেল

বেল একটি দীর্ঘজীবী উদ্ভিদ। গাছ ঝোপালো স্বভাবের। পাতা যৌগিক, ওভেট, পত্রফলকের

অগ্রভাগ সুঁচালো ও গাঢ় সবুজ বর্ণের। পত্র ঝরার সময় হালকা হলুদ বর্ণ ধারণ করে। ফুল দেখতে সাদা রঙের এবং সবসময় গুচ্ছাকারে জন্মে। ফুলে ৫টি করে মঞ্জরীপত্র, বৃত্তাংশ ও পাপড়ি বিদ্যমান। ফল আ্যম্ফিসারকা জাতীয় এবং বহুজীবী। ফল তুলনামূলকভাবে মাঝারি আকৃতির। বীজ সাধারণত গোলাকার এবং সাদা রঙের হয়। বেল উষ্ম ও অবউষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ। জাতটি পাহাড়ী এলাকাসহ বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য ও খরা সহিষ্ণু। বর্তমানে বেল বাংলাদেশের সর্বত্র জন্মে। এ ফলটি কাঁচা পাকা অবস্থাতেই খাওয়া যায়। তবে পাকা বেল সরবত তৈরিতে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। কাঁচা বেল পুড়ে খাওয়া হয়।

বারি বেল-১

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি বেল-১ নামে বেলের একটি জাত উদ্ভাবন করেছে। ফল মাঝারী আকারের। গড় ওজন ৯০০ গ্রাম। ফলের শীর্ষ গর্তের মত। রঙ হলুদাকার। স্থানীয় জাতের বেলের (৬৬.০%) তুলনায় বারি বেল-১ এর খাদ্যোপযোগী অংশ বেশি (৭৮.১%)। ফলের শাঁসের টিএসএস ৩৫% এবং তিতাবিহীন। ফলে বীজের সংখ্যা কম এবং প্রতিটি ফলে গড়ে ৯১টি বীজ পাওয়া যায়, ওজন ৯০০ গ্রাম।

উৎপাদন প্রযুক্তি

ক্রেফট গ্রাফটিং বা ফাটল কলমের সাহায্যে কলমের চারা তৈরি করা হয়। সাধারণত মে মাসের মাঝামাঝী সময়ে ৬০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতায় গর্ত করতে হবে। গর্ত করার সময় গর্তের উপরের অর্ধেক অংশের মাটি এক পার্শ্বে এবং নিচের অংশের মাটি অন্য পার্শ্বে রাখতে হবে। গর্ত থেকে মাটি উঠানোর ১০ দিন পর্যন্ত গর্তটিকে রৌদ্রে শুকাতে হয়। এরপর প্রতি গর্তে ১০ কেজি গোবর সার ও ১৫০ গ্রাম টিএসপি উপরের অংশের মাটির সাথে মিশিয়ে মাটি উলট-পালট করে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাটের সময় উপরের অর্ধেক অংশের মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট না করা হলে প্রয়োজনে পার্শ্ব থেকে উপরের মাটি গর্তে দিতে হবে। তবে গর্তের নিচের অংশের মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট না করা উত্তম। কলমের চারাটি জুন-জুলাই মাসে নির্ধারিত গর্তে রোপণ করতে হবে। রোপণের পর কলমের চারাটি সোজা করে খুঁটির সাথে বেঁেধ দিতে হবে এবং বৃষ্টি না হলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। কলমের চারা সংগ্রহ করে সারি থেকে সারি ও চারা থেকে চারা ৫ মিটার দূরত্বে গর্ত করে রোপণ করা হয়। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বৃদ্ধি করতে হবে। গাছের বয়স ১-২ বছর হলে পচা গোবর সার/আবর্জনা পচা সার ১৫ কেজি, ইউরিয়া সার ২৫০ গ্রাম, টিএসপি সার ২০০ গ্রাম, এমওপি সার ১৫০ গ্রাম, জিপসাম ১০০ গ্রাম,

জিংক সালফেট ২০ গ্রাম এবং বোরিক এসিড বা পাউডার ১৫ গ্রাম প্রতিটি গাছের জন্য বছরে একবার প্রয়োগ করতে হবে। কারণ ফল সংগ্রহ করার পরপরই গাছে নতুন পাতা আসবে এবং ফুল আসা শুরু করবে। গ্রাফটিং এর গাছ সাধারণত ৫-৬ বছর পর ফল দিয়ে থাকে।

পোকা-মাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা

বারি বেল-১ এ পোকা মাকড়ের উপদ্রব কম। জাতটি চাষাবাদে তেমন কোন বালাইনাশকের প্রয়োজন পড়ে না। তবে লেপিডোপটেরা পোকা বেলের পাতা খায়। নতুন পাতা বের হলে সাইপারমেথ্রিন, কার্বারিল, ইমিডাকোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক নির্দেশিত মাত্রায় মাত্র একবার ব্যবহার করলে পোকাটির আক্রমণ থেকে বেলের পাতাকে রক্ষা করা যাবে।

জলপাই

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ‘বারি জলপাই-১’ নামে একটি জাত উদ্ভাবন করেছে, এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হল

বারি জলপাই-১

উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ মধ্যম আকৃতির, ছড়ানো ও কিছুটা ঝোপালো। কার্তিক মাসের শেষার্ধ থেকে পৌষ মাসের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। ফল তুলনামূলকভাবে বড় (গড় ওজন ৪৬.৩৩ গ্রাম), পাকা ফলের রঙ হালকা সবুজ, শাঁস সাদা, এবং মধ্যম টক (টিএসএস ৬.২০%)। বীজ খুব ছোট, খাদ্যোপযোগী অংশ ৮৪.৯৯%। বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষযোগ্য। গাছপ্রতি ১,৯০০-২,০০০টি ফল ধরে যার গড় ওজন ১২৫ কেজি।

বংশ বিস্তার

বীজের মাধ্যমে সাধারণত বংশ বিস্তার করা হয়ে থাকে। বীজাবরণ খুব শক্ত বিধায় বীজ ২৪-৩০ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে অঙ্কুরোদগম ত্বরান্বিত হয়। বীজ থেকে উৎপাদিত চারায় মাতৃ গাছের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে না এবং এতে ফল আসতেও অধিক সময় লাগে। পক্ষান্তরে কলমের চারায় মাতৃ গাছের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে এবং এতে তাড়াতাড়ি ফল আসে। সাধারণত ১২-১৩ মাস বয়সের আদিজোড়ের সাথে ৩-৪ মাস বয়সের উপজোড় ভিনিয়ার/ফাটল পদ্ধতিতে কলম করা হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ বা মে- জুন মাস কলম করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এক বছর বয়সী সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত চারা রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন ও তৈরি:

বন্যার পানি দাঁড়ায় না এমন ধরনের উঁচু বা মাঝারী উঁচু জমি জলপাইয়ের জন্য নির্বাচন করতে

হবে। বাগান আকারে চাষ করার ক্ষেত্রে চাষ ও মই দিয়ে ভালভাবে জমি তৈরি করতে হবে। দীর্ঘজীবী আগাছা বিশেষ করে উলু ঘাস সমূলে অপসারণ করতে হবে।চারা রোপণের সময়: মে-অক্টোবর মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে পানি সেচের সুব্যবস্থা থাকলে সারা বছরই চারা রোপণ করা যেতে পারে।

গর্ত তৈরি:

কলম রোপণের অন্তত ১৫-২০ দিন পূর্বে ৭ মিটার X ৭ মিটার দূরত্বে ১ মিটার X ১ মিটারX ১ মিটার

আকারের গর্ত করে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখতে হবে। কলম রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে গর্তপ্রতি ১৫-২০ কেজি পচা গোবর, ৩০০-৪০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০-৩০০ গ্রাম এমওপি, ২০০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রেখে দিতে হবে। মাটিতে রসের পরিমাণ কম থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

চারা রোপণ ও পরিচর্যা:

গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারাটি গর্তের ঠিক মাঝখানে এমনভাবে বসাতে হবে

যেন চারার গোড়া ঠিক খাড়া থাকে এবং কোনভাবে আঘাত পাবার সম্ভাবনা না থাকে। চারা রোপণের পরপর পানি দিতে হবে এবং খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে । তারপর ১-২ দিন অন্তর পানি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

বেল গাছে সার প্রয়োগ:

গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে

সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিচের ছকে দেয়া হলো:

গাছের বয়স ১ থেকে ৪ বছর হলে প্রতি গাছে ১০ থেকে ১৫ কেজি গোবর সার, ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ গ্রাম টিএসপি, ৩০০ গ্রাম এমওপি এবং ১০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করা হয়। ৫ থেকে ১০ বছর বয়সী গাছের জন্য ১৫ থেকে ২০ কেজি গোবর, ৭৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৪৫০ গ্রাম টিএসপি, ৪৫০ গ্রাম এমওপি এবং ২০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োজন হয়। ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সী গাছের জন্য ২০ থেকে ৩০ কেজি গোবর সার, ১০০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৯০০ গ্রাম টিএসপি, ৬০০ গ্রাম এমওপি এবং ২৫০ গ্রাম জিপসাম ব্যবহার করা উচিত। ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে গাছের জন্য ৩০ থেকে ৪০ কেজি গোবর, ১২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১২০০ গ্রাম টিএসপি, ৭৫০ গ্রাম এমওপি এবং ৩০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করা হয়।

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি চৈত্র—বৈশাখ মাসে (ফল আহরণের পর), দ্বিতীয় কিস্তি ফল বাড়ন্ত পর্যায়ে (আষাঢ়—শ্রাবন মাসে) এবং শেষ কিস্তি আশ্বিন-কার্তিক মাসে প্রয়োগ করতে হবে। সারগুলো একত্রে মিশিয়ে গাছের চারদিকে গোড়া থেকে ০.৫-১.০ মিটার জায়গা ছেড়ে দিয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত এলাকা পর্যন্ত ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর সার ছিটানো জায়গার মাটি কুপিয়ে সারগুলো মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রস না থাকলে সার প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ ও পানি নিষ্কাশন:

যেহেতু জলপাই গাছ শুকনো আবহাওয়া ও খরা সহ্য করতে পারে, সেজন্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, মাটি ও গাছের বয়সের উপর ভিত্তি করে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। শীতকালে ৪-৫ সপ্তাহ ও গরমকালে ২-৩ সপ্তাহ পর পর সেচ দিলে ভাল হয়। ফল ধরার পর কমপক্ষে দুবার সেচ দিতে হবে। বর্ষা মৌসুমে গাছের

গোড়ায় যাতে জলবদ্ধতা না হয় সে জন্য দ্রুত পানি নিষ্কশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।

পুষ্টি ঘাটতিজনিত সমস্যা

বোরনের অভাব:

বোরনের অভাবে ফলের গায়ে দাদের মত খসখসে দাগ পড়ে। এত ফলের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয় এবং

বাজার মূল্য হ্রাস পায়।

প্রতিকার:

বর্ষার শেষের দিকে সার প্রয়োগের সময় গাছপ্রতি ৫০ গ্রাম হারে বরিক এসিড বা ১০০ গ্রাম হারে বোরাক্স

প্রয়োগ করতে হবে। ফলন্ত গাছে ০.২% হারে বরিক এসিড ¯স্প্রে করলেও উপকার পাওয়া যায়।

ফল সংগ্রহ:

বর্ষার প্রারম্ভে এপ্রিল-মে মাসে গাছে ফুল আসে এবং শীতের পূর্বে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফল পরিপক্ক হয়। পাকার পরও ফল সবুজ থাকে। তাই ফলের আকার বৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে ফল সংগ্রহ করতে হবে। ডালপালায় ঝাকুনি দিয়ে ফল মাটিতে ফেললে ফল আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তবে গাছের নিচে জাল ধরে শাখায় ঝাকুনি দিয়েও ফল সংগ্রহ করা যায়। ভাল যত্ন নিলে পূর্ণ বয়স্ক গাছ থেকে প্রতি বছর ২০০-২৫০ কেজি ফল পাওয়া যায়।

ড্রাগন ফল

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে অনেক দেশের ন্যায় সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ‘বারি ড্রাগন ফল-১’ নামে ড্রাগন

ফলের একটি উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে।

বারি ড্রাগন ফল-১

নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। বারি উদ্ভাবিত ড্রাগন ফলের জাতটি সুস্বাদু এবং এ থেকে প্রচুর সংখ্যক ফল আহরণ করা যায়। ফলের আকার বড় (৩৭৫.১১ গ্রাম), পাকা ফলের খোসা লাল। শাঁস

গাঢ় গোলাপী রঙের, রসালো এবং টিএসএস ১৩.২২%। খাদ্যোপযোগী অংশ ৮১%। বীজসমূহ

খুব ছোট কালো ও নরম। ফলে বেটা কেরোটিন ১২.০৬ মিলিমাইক্রো গ্রাম/১০০ গ্রাম এবং ভিটামিন সি ৪১.২৭ মি. গ্রাম/১০০ গ্রাম থাকে। তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সী গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৯ থেকে ১৫টি এবং ফলন ৩.২২ কেজি/গাছ/বছর এবং ২০.৬ টন/হেক্টর/বছর।

বংশ বিস্তার: অঙ্গজ উপায়ে অথবা বীজের মাধ্যমে ড্রাগন ফলের বংশ বিস্তার হয়ে থাকলেও মাতৃ গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য অঙ্গজ উপায়ে বংশ বিস্তার কাম্য। বীজ দিয়ে সহজে এ ফলের বংশ বিস্তার করা যেতে পারে। তবে এতে ফল ধরতে একটু বেশি সময় লাগে এবং হুবহু মাতৃ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। সেজন্য কাটিং এর মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা উত্তম। কাটিং এর সফলতার হার প্রায় শতভাগ এবং ফলও তাড়াতাড়ি ধরে। কাটিং থেকে উৎপাদিত একটি গাছে ফল ধরতে ১২-১৮ মাস সময় লাগে সাধারণত ছয় থেকে এক বছর বয়স্ক গাঢ় সবুজ শাখা হতে ২০ থেকে ৩০ সেমি লম্বা টুকরা কাটিং হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কাটিং ৫০ ভাগ পচা গোবর ও ৫০ ভাগ ভিটি বালুর মিশ্রণ দ্বারা পূর্ণ ৮ X ১০ ইঞ্চি আকারের পলি ব্যাগে স্থাপন করে ছায়া যুক্ত স্থানে রেখে দিতে হবে। ৩০ থেকে ৪৫ দিন পরে কাটিং এর গোড়া

থেকে শিকড় এবং কাণ্ডের প্রান্ত থেকে নতুন কুশি বেরিয়ে আসবে। তখন এটা মাঠে লাগানোর উপযুক্ত হবে। তবে উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী কাটিংকৃত কলম সরাসরি মূল জমিতেও লাগানো যায়।

জমি নির্বাচন ও তৈরি: ড্রাগন ফল চাষের জন্য সুনিষ্কাশিত উঁচু ও মাঝারী উঁচু ঊর্বর জমি নির্বাচন করতে হবে।

পর্যায়ক্রমিক কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে নিতে হবে। মাদা তৈরির পূর্বে জমি থেকে বহুবর্ষজীবী আগাছা বিশেষ করে উলুঘাস সমূলে অপসারণ করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি ও রোপণের সময়: সমতল ভূমিতে বর্গাকার কিংবা ষড়ভুজাকার এবং পাহাড়ী জমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে কাটিং ড্রাগন ফল রোপণ করতে হবে। কাটিং রোপণের পর হালকা ও অস্থায়ী ছায়ার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল। মধ্য এপ্রিল থেকে থেকে মধ্য অক্টোবর ড্রাগন ফল রোপণের উপযুক্ত সময়।

মাদা তৈরি: উভয় দিকে ২.৫-৩ মিটার দূরত্বে ১.৫ মিটার X ১.৫ মিটার X ১ মিটার আকারের গর্ত করে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখতে হবে। গর্ত তৈরির ২০-২৫ দিন পর প্রতি গর্তে ২৫-৩০ কেজি পচা গোবর, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি, ১৫০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। মাটিতে রসের অভাব থাকলে পানি সেচ দিতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর প্রতি গর্তে ৫০ সে.মি. দূরত্বে ৪টি ড্রাগন ফলের চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের ১ মাস পর থেকে ১ বছর পর্যন্ত ৩ মাস অন্তর প্রতি গর্তে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপণ ও পরিচর্যা: গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর প্রতি গর্তে ৫০ সেমি দূরত্বে ৪

টি চারা সোজাভাবে গর্তের মাঝখানে লাগিয়ে চারার চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হবে। রোপণের পরপরই পানি সেচ দিতে হবে। এরপর নিয়মিত পানি সেচ ও প্রয়োজনে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ড্রাগন ফলের গাছ লতানো এবং ১.৫ থেকে ২.৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এ জন্য গাছের সাপোর্টের জন্য চারা চরটির মাঝখানে ৪ মিটার লম্বা সিমেন্টের খুটি এমনভাবে পুতে দিতে হবে যাতে করে মাটির উপরে ৩ মিটার অবশিষ্ট থাকে। চারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে নারিকেলের রশি দিয়ে সিমেন্টের খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। গাছ বড় হলে কাণ্ড থেকে শিকড় বের হয়ে খুঁটিকে আকড়ে ধরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। প্রতিটি খুঁটির মাথায় একটি মটর সাইকেলের পুরাতন টায়ার মোটা তারের সাহায্যে আটকিয়ে দিতে হবে এবং গাছের মাথা ও অন্যান্য ডগা টায়ারের ভিতর দিয়ে বাহিরের দিকে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এইরূপ ঝুলন্ত ডগায় ফল ধরার পরিমাণ বেশি হয়।

আগাছা দমন: গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমিকে আগাছামুক্ত রাখা দরকার, বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে আগাছা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন: ড্রাগন ফল গাছ খরার ও জলাবদ্ধতার প্রতি খুব সংবেদনশীল। চারার বৃদ্ধির জন্য শুকনো মৌসুমে ১০-১৫ দিন পরপর সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছের বেলায় সম্পূর্ণ ফুল ফোটা পর্যায়ে একবার, ফল মটর দানার মত হলে একবার এবং এর ১৫ দিন পর আর এক বার মোট তিনবার সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। সার প্রয়োগের পর সেচ দেয়া ভাল। বর্ষার সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি না জমে থাকে তার জন্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া ফুল আসার ৬-৮ সপ্তাহ আগে সামান্য পানির কষ্ট/পীড়ন দিলে আগাম ও অধিক ফুল ফুটতে

দেখা যায়।

প্রুনিং ও ট্রেনিং: ড্রাগন ফল দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মোটা শাখা (ডগা) তৈরি করে। একটি এক বছরের গাছ ৩০টি পর্যন্ত

শাখা তৈরি করতে পারে এবং ৪ বছর বয়সী একটি ড্রাগন ফলের গাছ ১৩০টি পর্যন্ত প্রশাখা তৈরি করতে পারে। তবে শাখা-প্রশাখা উৎপাদন উপযুক্ত ট্রেনিং ও ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের ১২-১৮ মাস পর একটি গাছ ফল ধারণ করে। ফল সংগ্রহের পর ৪০-৫০ টি প্রধান শাখায় প্রত্যেকটিতে ১/২ টি সেকেন্ডারি শাখা অনুমোদন করা হয়। তবে এ ক্ষেতের টারসিয়ারি ও কোয়াটরনারি প্রশাখা কে অনুমোদন করা হয় না। ট্রেনিং এবং প্রুনিং এর কার্যক্রম দিনের মধ্য ভাগে করা ভালো। ট্রেনিং ও প্রুনিং করার পর অবশ্যই যে কোন ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে। অন্যথায় বিভিন্ন প্রকার রোগ বালাই আক্রমণ করতে পারে।

ফল সংগ্রহ ও ফলন: গোলাকার থেকে ডিম্বাকার উজ্জ্বল গোলাপী থেকে লাল রঙের ফল। যার ওজন ২০০-৭০০

গ্রাম। এ ফলগুলো ৭-১০ সেমি চওড়া এবং ৮-১৪ সেমি লম্বা হয়। ভিতরের পাল্প সাদা, লাল, হলুদ ও কালো রঙের হয়। পাল্পের মধ্যে ছোট ছোট কালো নরম অনেক বীজ থাকে। এই বীজগুলো দাঁতের নিচে পড়লে সহজেই গলে যায়। এ ফলগুলো হালকা মিষ্টি। এর মিষ্টতা (টি.এস.এস./ব্রিক্স ১৬-২৪%) ফলগুলো দেখতে ড্রাগনের চোখের মতো রঙ ও আকার ধারণ করে। ফলটির সামনের শেষের দিকে হালকা গর্তের মতো থাকে। এ ফলের চামাড়ার উপরে আনারসের মতো স্কেল থাকে। পূর্ণ বয়স্ক একটি গাছে ২৫-৩০টি পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন।

সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা: ড্রাগন ফল নন ক্লাইমেটারিক ফল হওয়ায় সংগ্রহোত্তর ইথিলিন উৎপাদন ও শ্বসনের হার কম থাকে। এই কারণে ফল পরিপক্ক অবস্থায় সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত ফল ও স্পাইনলেটের রঙ লালচে বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হবে। অপরিপক্ক ফলে মিষ্টতা ও অন্যান্য গুণাবলী পরিপক্ক ফলের তুলনায় অনেক কম থাকে। ভাল বাজারমূল্য পাওয়ার জন্য ফল লালচে বর্ণ ধারণ করার ৫-৭ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা ভাল। গাছে ফল অতিরিক্ত পাকিয়ে সংগ্রহ করলে ফলের চাসরা ফেটে যেতে পারে এবং ফলের সংরক্ষণকাল কমে যায়। অধিক পরিপক্ক ফল খুব দ্রুত আর্দ্রতা হারায় এবং নষ্ট হতে থাকে।

নাশপাতি

নাশপাতি মূলত শীতপ্রধান অঞ্চলের ফল। তবে এর কোন কোন প্রজাতি বা জাত অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রায়ও জন্মানো যায়। এটি বিদেশি ফল হলেও আমাদের দেশে কম বেশি সবাই ফলটির সাথে পরিচিত। বিদেশ থেকে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে নাশপাতি আমদানি করা হয়। দেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ ফলের চাষ করা সম্ভব।

নাশপাতির জাত

বারি নাশপাতি-১

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ‘বারি নাশপাতি-১’ নামে নাশপাতির একটি জাত ২০০৩ সালে অবমুক্ত করেছে। নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। নাশপাতির গাছ খাড়া ও অল্প ঝোপালো। চৈত্র মাসে গাছে ফুল আসে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল আহরণ করা যায়। ফলের গড় ওজন ১৩৫ গ্রাম, আকার ৮.৪০ সেমি X ৫.৬৩ সেমি। ফল বাদামী রঙের, ফলের উপরিভাগের ত্বক সামান্য খসখসে। শাঁস সাদাটে, খেতে কচকচে (টিএসএস ১০%)। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৬০-৭০টি। জাতটি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য জেলাসমূহে চাষ উপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ৬-৭ টন।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: সাধারণভাবে নাশপাতিকে শীতপ্রধান অঞ্চলের ফল হিসেবে গণ্য করা হয়। যেকোন ধরনের সুনিষ্কাশিত মাটিতে নাশপাতি চাষ করা যায়। তবে ঊর্বর, সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটি উত্তম। নাশপাতি চাষের জন্য সূর্যালোক প্রয়োজন। শুষ্ক গরম বায়ু নাশপাতির জন্য ক্ষতিকর। মাটির পিএইচ মান ৫.৫-৭.৫ উত্তম। নাশপাতি গাছ লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে না।

বংশ বিস্তার: স্টেম কাটিং বা শাখা কর্তন ও গুটি কলমের মাধ্যমে নাশপাতির বংশ বিস্তার করা যায়। বর্ষাকাল কলম করার উপযুক্ত সময়। এক বছর বয়স্ক পেন্সিল আকৃতির ডাল কলমের জন্য নির্বাচন করা হয়। ছিদ্রযুক্ত পলিথিনে কলম স্থাপন করে নার্সারিতে ঝাঝরী দিয়ে পানি দেয়াসহ প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করলে এক বছরের মধ্যে চারা রোপণের উপযোগী হয়।

জমি তৈরি: সুনিষ্কাশিত উঁচু জমি যেখানে কখনই পানি দাঁড়ায় না নাশপাতির জন্য এরকম জমি উত্তম। পাহাড়ের হালকা ঢালু জমিতে নাশপাতি ভাল জন্মে। জমি গভীরভাবে চাষ দিয়ে আগাছা ভালভাবে পরিষ্কার করে জমি তৈরি করতে হয়। চারা রোপণ করার জন্য ৭৫ X৭৫ X ৭৫ সেমি আকারের গর্ত করে প্রতি গর্তে ১৫ কেজি পচা গোবর, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২০০ গ্রাম এমওপি ও ২০ গ্রাম বরিক এসিড মিশ্রিত করে ১৫/২০ দিন রেখে দিয়ে তারপর চারা লাগাতে হবে।

রোপণ ও পরিচর্যা: সাধারণত সমতল ভূমিতে বর্গাকার এবং পাহাড়ের ঢালে কন্টুর রোপণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যস্ত চারা লাগানোর উত্তম সময়। তবে সেচ সুবিধা থাকলে সারা বছরই চারা লাগানো যায়। সারি থেকে সারি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৪ মিটার। এ হিসেবে প্রতি হেক্টর জমিতে ৬২৫টি চারা দরকার হয়। মাদা তৈরি করার পর তাতে ১৫-২০ দিন পর চারা বা কলম লাগাতে হয়। গর্তের ঠিক মাঝখানে চারা লাগাতে হবে তারপর খুঁটি দিয়ে চারাটি বেঁধে দিতে হবে যাতে হেলে না পড়ে। চারা লাগানোর পর চারার গোড়ায় ঝাঝরী দিয়ে পানি দিতে হবে। প্রয়োজনে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ: বয়স অনুপাতে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিচে দেয়া হলো।

১ থেকে ২ বছর বয়সী গাছের জন্য প্রতি গাছে ১০ কেজি পচা গোবর, ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২০০ গ্রাম এমওপি এবং ২০ গ্রাম বোরিক অ্যাসিড প্রয়োজন।

৩ থেকে ৫ বছর বয়সী গাছের ক্ষেত্রে প্রতিটি গাছে ১৫ কেজি পচা গোবর, ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৪০০ গ্রাম টিএসপি, ৪০০ গ্রাম এমওপি ও ৩০ গ্রাম বোরিক অ্যাসিড প্রয়োজন হয়।

৬ থেকে ৯ বছর বয়সী গাছে ২০ কেজি পচা গোবর, ৭৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ৬০০ গ্রাম এমওপি এবং ৪০ গ্রাম বোরিক অ্যাসিড প্রয়োজন।

১০ বছর বা তার বেশি বয়সী গাছের জন্য ৩০ কেজি পচা গোবর, ১০০০ গ্রাম (১ কেজি) ইউরিয়া, ৭৫০ গ্রাম টিএসপি, ৮০০ গ্রাম এমওপি এবং ৪০ গ্রাম বোরিক অ্যাসিড দেওয়া হয়।

এইভাবে সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করলে গাছের সঠিক বৃদ্ধির পাশাপাশি ফলনও ভালো পাওয়া যায়।

উল্লিখিত সার সমান দুই ভাগ করে বর্ষার আগে একভাগ ও বর্ষার পর বাকি একভাগ প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগ করার সময় ঠিক মধ্য দুপুরে গাছের ছায়া গোড়ার চারদিকে যতটুকু জায়গায় বিস্তৃত হয় এবং গাছের গোড়া থেকে ০.৫ থেকে ১.০ মিটার জায়গা খালি রেখে সেই পরিমাণ জায়গায় ছিটিয়ে কোদাল দিয়ে হালকা করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। পাহাড়ের ঢাল বেশি হলে ঢালের উপরের দিকে গাছের গোড়া থেকে ৪০ সেমি দূরে ১ মিটার এর মধ্যে চোখা মাথা খুঁটির সাহায্যে গর্ত করে সার প্রয়োগ করে গর্তের মুখ মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। সার প্রয়োগ করার পর প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে।

আগাছা দমন: গাছের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য সবসময় জমি পরিষ্কার বা আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে গাছের গোড়া থেকে চারদিকে ১ মিটার পর্যস্ত জায়গা সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ও নিষ্কাশন: চারা রোপণের পর ঝরনা দিয়ে বেশ কিছু দিন পর্যস্ত সেচ দিতে হয়। সর্বোচ্চ ফলনের জন্য ফুল আসা ও ফলের বিকাশের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক। এ জন্য খরা মৌসুমে সেচ দেয়া প্রয়োজন। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সে জন্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ: গাছের উচ্চতা ৪০-৫০ সেমি হলে ডগা ভেঙ্গে দিতে হবে। পরের বছর পার্শ্ব শাখা ২০-২৫ সেমি রেখে কেটে দিতে হবে। গাছের গোড়ার দিকে জল/শোষক শাখা বের হলে কেটে ফেলতে হবে। গাছ বড় হলে ডালগুলো ভূমির দিকে বাঁকা করে দিলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।

ডাল নুয়ে দেয়া: নাশপাতির খাড়া ডালে নতুন শাখা ও ফল কম হয়। এ জন্য খাড়া ডাল ওজন অথবা টানার সাহায্যে নুয়ে দিলে প্রচুর সংখ্যক নতুন শাখা গজায়। এতে ফলন ও ফলের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

ফল সংগ্রহ ও ফলন: মার্চ-এপ্রিল মাসে গাছে ফুল আসে। জুলাই মাসের শেষ পক্ষে ফল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। ফল অতি সাবধানে সংগ্রহ করা প্রয়োজন যাতে মাটিতে না পড়ে। কারণ আঘাতপ্রাপ্ত ফল সংরক্ষণ করা যায় না। ফল সংগ্রহের পর সংরক্ষণের জন্য ভালভাবে বাছাই করা দরকার যাতে কোনরূপ ত্রুটিযুক্ত ফল না থাকে। তারপর কাগজ বা কাঠের বাক্সে করে বাজারজাত করা উত্তম। এভাবে ১০-১২ দিন পর্যস্ত ফল সংরক্ষণ করা যায়। গাছের বয়স ও আকারভেদে নাশপাতির ফলনে তারতম্য ঘটে। একটি পূর্ণ বয়স্ক গাছ থেকে ২০ - ৪০ কেজি পর্যস্ত ফল সংগ্রহ করা যায়।

প্যাশন ফল

প্যাশন ফল বাংলাদেশে একটি অপ্রচলিত বা স্বল্প পরিচিত ফল। অনেকের কাছে এটি ট্যাং ফল নামে পরিচিত। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্রগ্রাম অঞ্চল, সিলেট, টাঙ্গাইল এবং রাজশাহী অঞ্চলে ইহা কম বেশি দেখা যায়। তবে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আদিবাসীদের বসতবাড়িতে স্বল্পপরিসরে অনেকটা অযত্নে ও অবহেলায় ফলটির আবাদ লক্ষ্য করা যায়। ঝুমকো লতার সমগোত্রীয় প্যাশন ফলের গাছ দীর্ঘ প্রসারী এবং বহুবর্ষজীবী। ফলের ভিতর গাত্রে অসংখ্য হলুদাভ, রসপূর্ণ থলে থাকে, এগুলি ভক্ষণযোগ্য অংশ। টাটকা ফল হিসেবে খাওয়ার চেয়ে প্যাশন ফলের তৈরি শরবত বেশি উপাদেয়। বাংলাদেশের পাহাড়ী এলাকায় এবং সিলেট ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে প্যাশন ফল চাষের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

প্যাশন ফলের জাত

বারি প্যাশন ফল-১

বিদেশ থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম মূল্যায়ন শেষে ‘বারি প্যাশন ফল-১’ নামে উন্নত জাতটি ২০০৩ সালে মুক্তায়ন করা হয়। নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ দীর্ঘ প্রসারী, বহুবর্ষজীবী এবং কাষ্ঠল লতা জাতীয়। পাকা ফল দেখতে হলুদ রঙের এবং গাত্র খুবই মসৃণ। ফল উপবৃত্তাকার,

আকার ৬.৮ X ৬.৩ সেমি। ফলের গড় ওজন ৬৮ গ্রাম এবং প্রতি ফল থেকে ৩০ গ্রাম

জুস আহরণ করা যায়। জুসের রং হলুদ, টক-মিষ্টি স্বাদের (টিএসএস ১৪%)। এ জাতটি

পার্বত্য জেলাসমূহে চাষাবাদের উপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ৫-৬ টন। জাতটি

ফিউজেরিয়াম উইল্ট ও নেমাটোড রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: সাধারণভাবে প্যাশন ফলকে উষ্ণ ও অব-উষ্ণ অঞ্চলের ফল হিসেবে গণ্য করা হয়। অধিক উষ্ণতা ও শৈত্য কোনটাই এ ফলের জন্য ভাল নয়। বৃষ্টিপাত ফুলের পরাগায়ণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। যে কোন ধরনের সুনিষ্কাশিত মাটিতে প্যাশন ফলের চাষ করা যায়। তবে ঊর্বর, সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটি উত্তম। প্যাশন ফল জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। মাটির ক্ষারত্ব ৫.৫-৭.৫ উত্তম। ক্ষারত্ব ৫.৫ এর নিচে হলে চুন প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। প্যাশন ফল লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে না।

বংশ বিস্তার: বীজ দ্বারা সহজেই প্যাশন ফলের বংশ বিস্তার করা যায়। তবে বীজ থেকে উৎপাদিত চারায় মাতৃ গাছের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকে না বিধায় অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করা উত্তম। স্টেম কাটিং বা শাখা কর্তনের মাধ্যমে প্যাশন ফলের অঙ্গজ বংশ বিস্তার করা যায়। এক থেকে দেড় বছর বয়সী শাখা নির্বাচন করে তা থেকে ২০-৩০ সেমি লম্বা করে কেটে একেকটি শাখা কলম তৈরি করা হয় যাতে অস্তত ২-৩টি পর্বসন্ধি (নোড) থাকে। কাটিং এর নিচের পর্ব হতে ১-২ সেমি নিচে তেরসা কাট দিয়ে এর নিচের পর্বসহ একেকটি কাটিং পৃথক পৃথক পলিব্যাগের মাটিতে ৪৫০ কোণ করে পুঁতে চারা তৈরি করা হয়। কাটিং দ্বারা চারা তৈরির উপযুক্ত সময় হচ্ছে জুন-আগস্ট মাস।

জমি তৈরি: সুনিষ্কাশিত উঁচু জমিতে যেখানে কখনই পানি দাঁড়ায় না প্যাশন ফলের জন্য এরকম জমি উত্তম। জমি গভীরভাবে চাষ দিয়ে আগাছা ভালভাবে পরিষ্কার করে জমি তৈরি করতে হয়। চারা রোপণ করার জন্য ৪৫ X ৪৫ X ৪৫ সেমি গর্ত করে প্রতি গর্তে ১০ কেজি জৈব সার, ২০০ গ্রাম টিএসপি, ২০০ গ্রাম এমওপি সার মিশ্রিত করে ১৫/২০ দিন রেখে দিয়ে তারপর চারা লাগাতে হবে।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা: বাণিজ্যিকভাবে প্যাশন ফল সারি করে লাগাতে হয়। সাধারণত জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যস্ত চারা লাগানোর উত্তম সময় তবে যদি সেচ সুবিধা থাকে তাহলে সারা বছর চারা লাগানো যায়। সারি থেকে সারি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৪ মিটার। এই হিসেবে প্রতিহেক্টর জমিতে ৬২৫টি চারা/কলম দরকার হয়। মাদা তৈরির ১৫-২০ দিন পর চারা বা কলম গর্তের ঠিক মাঝখানে লাগাতে হয়। রোপণের পর হাত দিয়ে আলতোভাবে মাটি চারার গোড়ার চারদিকে বসিয়ে দিতে হবে। তারপর খুঁটি দিয়ে চারাটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে যাতে হেলে না পড়ে। চারা লাগানোর পরপরই চারার গোড়ায় পানি দিতে হবে এবং বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ: নিচে বয়স অনুপাতে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ দেওয়া হলো।

গাছের বয়স অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সার ব্যবহারের পরিমাণ নিচে সাধারণ অনুচ্ছেদ আকারে দেওয়া হলো:

১ থেকে ২ বছর বয়সী গাছের জন্য প্রতি গাছে ৬ কেজি পচা গোবর, ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ১৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ১৫০ গ্রাম এমওপি প্রয়োগ করা উচিত।

৩ থেকে ৫ বছর বয়সী গাছের ক্ষেত্রে ৮ কেজি পচা গোবর, ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৩০০ গ্রাম এমওপি প্রয়োগ করতে হয়।

৬ থেকে ৯ বছর বয়সী গাছে ১০ কেজি পচা গোবর, ৪৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৪৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ৪৫০ গ্রাম এমওপি প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

১০ বছর বা তার অধিক বয়সী গাছের জন্য ১৫ কেজি পচা গোবর, ৬০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৪৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ৬০০ গ্রাম এমওপি প্রয়োগ করা হয়।

এই মাত্রায় সার প্রয়োগ করলে গাছ সুস্থভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ফলনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

আগাছা দমন: গাছের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য সবসময় জমি পরিষ্কার বা আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে গাছের গোড়া থেকে চারদিকে এক মিটার পর্যস্ত জায়গা সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ও নিষ্কাশন: চারা রোপণের পর বেশ কিছু দিন পর্যন্ত নিয়মিত সেচ দিতে হয়। সর্বোচ্চ ফলনের জন্য ফুল আসা ও ফলের বিকাশের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক। এ জন্য খরা মৌসুমে প্যাশন ফলে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সেজন্য নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ: গাছের গোড়া থেকে ১.৫- ২.০ মিটার পর্যস্ত কোন ডালপালা রাখা হয় না তাই এ সমস্ত ডালা সব সময় কেটে দেওয়া ভাল। যেহেতু নতুন শাখায় বেশি ফুল ও ফল উৎপন্ন হয় তাই প্রতি বছর নিয়মিত কিছু শাখা প্রশাখা কেটে দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে পুরাতন ও মরা ডাল কেটে দিতে হয়। শীতকালই ডাল ছাঁটাইকরণের উপযুক্ত সময়।

মাচা তৈরি: লতা জাতীয় গাছ হওয়ায় প্যাশন ফলে মাচা দেয়া আবশ্যক। প্যাশন ফল বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য বিভিন্ন ধরনের মাচা তৈরি করা হয়ে থাকে। জিআই তার দিয়ে স্থায়ীভাবে মাচা তৈরি করা যায়। তবে অস্থায়ীভাবে বাঁশ দ্বারাও মাচা তৈরি করা যায়। চারা লাগানোর পর যখন চারা বাড়তে শুরু করে অর্থাৎ ৩-৪ মাস পর মাচা তৈরি করতে হয় যাতে গাছের লতা সহজেই মাচায় উঠতে পারে। মাচার উচ্চতা ১.৫ মিটার হলে ভাল হয় যাতে সহজে ফল আহরণ করা যায় ও অন্যান্য পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। প্রতি ১/২ সারিতে ১টি করে মাচা তৈরি করা যায়।

ফল সংগ্রহ: প্যাশন ফলে ফুল আসার প্রধান মৌসুম হল মার্চ মাস এবং তা থেকে জুলাই-আগস্ট মাসে ফল আহরণ করা হয়। আবার অনেক সময় আগস্ট মাসেও কিছু ফুল আসে তা থেকে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ফল আহরণ করা যায়। ফল সংগ্রহ করার পর প্রথমে সর্টিং এর মাধ্যমে ভাল ও ত্রুটিপূর্ণ (বাজারজাতকরণের অনুপযোগী) ফলগুলো আলাদা করা হয়। তারপর ভাল ফলগুলো গ্রেডিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সাইজ অনুপাতে ভাগ করে বাজারজাত করা হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা

মাছি পোকা দমন: ফলের মাছি পোকা অনেক সময় কচি ফলের গায়ে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে এবং তাতে

ফল কুচকে যায় ও অপরিপক্ক অবস্থায় ফল ঝরে পড়ে। সেক্স ফেরোমন ফাদ ব্যবহার করে মাছি পোকা সাফল্যজনক ভাবে দমন করা যায়।

উডিনেস রোগ দমন: অনেক সময় উডিনেস নামক একটি রোগ নাশপাতি গাছে দেখা যায় যা কিউকাম্বার মোজাইক ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয়। এ রোগ আক্রান্ত পাতা বিবর্ণ হয়ে আকারে ছোট

হয়। ফলের খোসা মোটা ও শক্ত হয় এবং অল্প পাল্প উৎপন্ন হয়। জাব পোকা দ্বারা এ রোগ ছড়ায়। এ

রোগের প্রতিকারের জন্য বাহক পোকা দমন করতে হয়।

তেঁতুল

আমাদের দেশে অপ্রধান ফলের মধ্যে তেঁতুল অন্যতম। ছোট বড় সকলের কাছে বেশ জনপ্রিয়, বিশেষ করে আচার এর জন্য তেঁতুলের কদর বেশি। দেশে তেঁতুলের মোট উৎপাদন প্রায় ১০ হাজার টন। টক এবং মিষ্টি দুই ধরনের স্বাদের তেঁতুল রয়েছে। তবে দেশে উৎপাদিত তেঁতুলের অধিকাংশই টক শ্রেণির। পাকা ফল টাটকা অবস্থায় খাওয়া ছাড়াও চাটনি, সস, শরবত, আচার প্রভৃতি মুখরোচক খাবার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

তেঁতুলের জাত

বারি তেঁতুল-১

নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। ‘বারি তেঁতুল-১’ জাতটি বিদেশ হতে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবন করে ২০০৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হয়। গাছ মাঝারী, মধ্যম ঝোপালো ও ছড়ানো। এপ্রিল-মে মাসে গাছে ফুল আসে এবং মার্চ মাসে ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়। ফল মাঝারী (৩২ গ্রাম)। শাঁস নরম, আঠালো এবং মিষ্টি

(টিএসএস ৭৫%)। খাদ্যপযোগী অংশ ৫৩%। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ টন। বারি তেঁতুল-১

তেঁতুল আমাদের দেশে অত্যন্ত সুপরিচিত একটি ফল হলেও মিষ্টি তেঁতুল ততোটাই অপরিচিত। তেঁতুলের নাম শোনা মাত্রই সবার কাছে একটি টক স্বাদের ফলের কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু এই তেঁতুলটি সম্পূর্ণ মিষ্টি স্বাদযুক্ত একটি ফল। ২০০৯ সালে পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি ‘বারি তেঁতুল-১’ নামে একটি মিষ্টি তেঁতুলের জাত উদ্ভাবন করেছে। এই মিষ্টি তেঁতুলের উৎপত্তিস্থল থাইল্যান্ড। ১৯৯৯ সালে প্রথম খাগড়াছড়িতে এর গাছ লাগানো হয় এবং ২০০৭ সালে এটি প্রথম ফল দেয়। মিষ্টি তেঁতুল লিগিউমিনোসী পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। খাদ্যমানের দিক থেকেও এটি একটি অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিমান সমৃদ্ধ ফল। প্রতি ১০০ গ্রাম মিষ্টি তেঁতুলে ৭০ গ্রাম ক্যালরি, ১৪.৭ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৮৬৭ আই.ইউ ভিটামিন ‘এ’, ৪২৯ মি. গ্রাম ক্যালসিয়াম, ৪৪ মি. গ্রাম ভিটামিন ‘সি’, ২.৩ গ্রাম প্রোটিন ও ৬.৩ গ্রাম আঁশ পাওয়া পায়। তদুপরি মিষ্টি তেঁতুলে রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম এবং

এর চাষাবাদ সহজ হওয়ায় বাংলাদেশে বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে এর চাষাবাদের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। মিষ্টি তেঁতুলের বাজার মূল্য ও চাহিদা খুব বেশি। তাই বাংলাদেশে এর চাষাবাদ ও প্রচার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা দরকার।

জলবায়ু ও মাটি: মিষ্টি তেঁতুল মৃদু উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে ভাল জন্মে। তবে সুনিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকলে ভারী

বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থানেও হয়। উঁচু, ঊর্বর, গভীর সুনিষ্কাশিত এবং মৃদু অম্লভাবাপন্ন বেলে দোআঁশ মাটিতে ভাল হয়। মিষ্টি তেঁতুলের জন্য সর্বোচ্চ ৪৬ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা এবং বাৎসরিক ৫০০-১৫০০ মি.মি. বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। মিষ্টি তেঁতুল সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় ১,০০০ মি. উচ্চতা পর্যন্ত জন্মে। সাধারণত এ গাছ মৃদু অম্ল ও ক্ষারযুক্ত মাটি সহ্য করতে পারে। কিন্তু বেলে দোআঁশ মাটিতেও ভাল হয়।

বংশ বিস্তার: বীজ এবং অঙ্গজ দুই ভাবেই মিষ্টি তেঁতুলের বংশ বিস্তার করা সম্ভব।

বীজ দ্বারা: পরিপক্ক বীজ বীজতলায় চারা তৈরি করে বংশ বিস্তার করা যায়। এক্ষেত্রে বীজ গজানোর জন্য এক সপ্তাহ সময় লাগে। মিষ্টি তেঁতুলের বীজ ভালভাবে শুকিয়ে রাখলে কয়েক মাস পর্যন্ত এর সজীবতা বজায় থাকে। কিন্তু বংশ বিস্তারের জন্য সংগৃহীত বীজ একটি উৎকৃষ্ট মানসম্পন্ন গাছ থেকে নির্বাচিত হওয়া উচিত। বীজ থেকে প্রাপ্ত গাছের গুণাগুণ মাতৃগাছের মত না হওয়ায় এবং ফলন দেরিতে হওয়ায় এ পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই পরিহার করা হয়। বীজ থেকে প্রাপ্ত গাছ ৭-৮ বছরে ফল দেয়।

অঙ্গজ বংশ বিস্তার: মিষ্টি তেঁতুলের ক্ষেত্রে অঙ্গজ উপায়ে বংশ বিস্তার করে ভাল ফল পাওয়া সম্ভব। অঙ্গজ উপায়ে উৎপাদিত গাছে মাতৃগাছের গুণাগুণ বজায় থাকে। এক্ষেত্রে গুটি কলম ও গ্রাফটিং এর মাধ্যমে ভাল ফল পাওয়া যায়। এরকম গাছ থেকে ৩-৪ বছরের মধ্যেই ফল পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এই সব পদ্ধতির ক্ষেত্রে গাছের কাণ্ডটি নির্বাচনের পূর্বে খুব ভাল করে খেয়াল করতে হবে যে, তা যেন রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়।

লেয়ারিং: বর্ষাকাল গুটি কলম করার উপযুক্ত সময়। এক বছর বয়স্ক পেন্সিল আকৃতির ডাল গুটি

কলমের জন্য নির্বাচন করা হয়। শাখার অগ্রভাগ থেকে ৩০-৪০ সেমি দূরে পর্বসন্ধি থেকে ১ সেমি নিচে ৩-৪ সেমি জায়গা জুড়ে শাখার চতুর্দিকের বাকল তুলে ফেলা হয়। তারপর ক্ষতস্থানে লালচে স্তর (ক্যাম্বিয়াম) চাকু দ্বারা ভালভাবে চেঁছে তুলে ফেলা হয়। ক্যাম্বিয়াম স্তর না তুলে ফেলা হলে এতে শিকড় গজায় না। এরপর ক্ষতস্থানের অগ্রবর্তী নিকটতম পর্বসন্ধিসহ ক্ষতস্থানটিকে শিকড় মাধ্যম (অর্ধেক মাটি, অর্ধেক গোবর ও পানির মিশ্রণে তৈরি পেস্টের মতো) দ্বারা আবৃত করে সাদা পলিথিন কাগজ দ্বারা পেঁচিয়ে চিকন সুতলি দ্বারা বেঁধে দিতে হবে। এ কলম করার ৪-৮ সপ্তাহের মধ্যে এতে শিকড় গজায়। শিকড় গজানোর পর গুটির ১-২ সেমি নিচে ২-৩ ধাপে কলমটিকে কেটে মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কিছু পাতা ফেলে দিয়ে ছিদ্রযুক্ত পলিথিনে কলম স্থাপন করে নার্সারিতে ঝাঁঝড়ি দিয়ে পানি দেয়াসহ প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করলে এক বছরের মধ্যে চারা রোপণের উপযোগী হয়।

গ্রাফটিং: গ্রাফটিং বলতে বুঝায় একটি কাঙ্ক্ষিত গাছের একটি কাণ্ড বা মুকুল কেটে নিয়ে অপর একটি গাছে (রুটস্টক) প্রতিস্থাপন করা। তারপর প্রতিস্থাপিত কাণ্ডটি অথবা মুকুলটি রুটস্টকের সাথে সফলভাবে জোড়া লেগে গেলেই গ্রাফটিং সফলভাবে শেষ হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। গ্রাফটিং করার সময় সাধারণত একটি অধিক কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গাছ থেকে কাণ্ড বা কুঁড়ি সংগ্রহ করে অপর একটি সাধারণ রুটস্টকে সংযোজন করা হয়। গ্রাফটিং ফল ধারণের সময় কমিয়ে আনে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

গ্রাফটিং এ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসমূহ হলো:

 একটি পরিষ্কার ও ধারালো কাঁচি

 পলিথিন ট্যাপ (১.৫-২ সেমি চওড়া ও মোটামুটি ৩০-৪০ সেমি লম্বা যা একটি সাধারণ পরিষ্কার প্লাস্টিক ব্যাগ থেকে কেটে সংগ্রহ করেও কাজ চালানো সম্ভব যদি বাডিং ট্যাপ না থাকে।

ক্লেফট গ্রাফটিং বা ফাটল জোড়কলম: বসন্ত ও শরৎকাল এ কলম করার সবচেয়ে উপযোগী সময়। বিশেষত বসন্তের শুরুতে যখন গাছের সুপ্ততা ভেঙ্গে আসতে থাকে তখনই এ কলম করা হয়। এ কলম তৈরির জন্য সাধারণত ২.৫-১০ সেমি ও ব্যাসের আদিজোড় নির্বাচন করা হয়ে থাকে। নির্বাচিত আদিজোড়ের মসৃণ শাখাবিহীন স্থানে ধারালো ছুরি দ্বরা আনুভূমিকভাবে কেটে সেখানে লম্বাভাবে ৫-৭.৫ সেমি গভীর করে ফাটাতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় যেন ফাটানো কাজটি খাড়াভাবে হয়। উপজোড় প্রস্তুতের জন্য সাধারণত ২-৩টি কুঁড়িযুক্ত ৭.৫-১০ সেমি দীর্ঘ উপজোড় শাখা নির্বাচন হয়। নির্বাচিত উপজোড়ের নিচের প্রান্তে তির্যক কর্তনের মাধ্যমে একটি গোজের মত তৈরি করা হয়। অপেক্ষাকৃত বড় আদিজোড় অর্থাৎ ২.৫ সেমি ব্যাসের চেয়ে বেশি ব্যসযুক্ত আদিজোড়ের জন্য একটি উপজোড় গোজের পরিবর্তে দুটি গোজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রতিটি গোজকেই ফাটলের যে কোন একপাশে বা কিনারে স্থাপন করা হয়। যদি এ ফাটলের মধ্যে উপজোড় গোজ শক্ত বা আঁটোসাঁটো হয়ে না বসে তবে সংযোগস্থান শক্ত করে

বেঁধে আটোঁসাঁটো করা হয় এবং সংযোগ স্থান গ্রাফটিং মোম দ্বারা এমনভাবে আবৃত করা হয় যাতে ভিতরে কোন পানি ঢুকতে না পারে। এছাড়া সমস্ত কলমটিকে একটি পলিথিন দ্বারা আবৃত রাখলেও কলমের মধ্যে সহজে পানি ঢুকতে পারে না।

চারা রোপণের সময়: চারা রোপণ জুন-নভেম্বর মাসে করতে হবে। অতঃপর চারা প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। তবে আষাঢ়-ভাদ্র (মধ্য জুন-মধ্য সেপ্টেম্বর) মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

জমি প্রস্তুত ও গর্ত তৈরি: গর্ত তৈরির পূর্বে জায়গাটির আগাছা ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় গাছপালা অপসারণ করতে হবে। তারপর কোদালের সাহায্যে গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের আকার হতে হবে ১ মি. X১ মি. X ১ মি.।

গর্তে সার প্রয়োগ:

উল্লিখিত সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে। মাটিতে রসের পরিমাণ কম থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

চারা রোপণের দূরত্ব: ১০ মি. X ১০ মি.।

চারা রোপণ: সুস্থ সতেজ এক বছর বয়সী চারা গর্তের মাঝখানে এমনভাবে রোপণ করতে হবে যেন চারার গোড়াটি মাটির বল ভেঙ্গে না যায়। চারা রোপণের পর গাছের গোড়ার মাটি ভালভাবে চেপে দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে। রোপণের পর চারা যাতে হেলে না পড়ে সে জন্য শক্ত কাঠি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে এবং চারায় বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা: চারা অবস্থায় গাছের চারদিকের আগাছা অবশ্যই পরিষ্কার করা উচিত। অন্তত চার বছর পর্যন্ত আগাছা ব্যবস্থাপনা করা উচিত যাতে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত না হয়। বাণিজ্যিকভাবে যে সব বাগান করা হয় বিশেষ করে সেসব ক্ষেত্রে যদি আন্তঃফসল হিসেবে কোন গাছ না থাকে তাহলে আগাছা দমন অত্যন্ত জরুরি। এতে বাগানের মাটিতে সঠিক পরিমাণে আর্দ্রতা ধরে রাখা সম্ভব।

সারের নাম সারের পরিমাণ

পচা গোবর : ২০-২৫ কেজি

টিএসপি :৪০০-৫০০ গ্রাম

এমপি :৫০০-৬০০ গ্রাম

জিপসাম : ২০০-৩০০ গ্রাম

জিঙ্ক সালফেট : ৪০-৬০ গ্রাম

আন্তঃফসল: গাছ লাগানোর প্রথম চার বছর পর্যন্ত বাগানে আন্তঃফসল করা যায়। এ ক্ষেত্রে আন্তঃফসল হিসেবে সাধারণত বাদাম, শাকসবজি, বরবটি, মুগডাল, ফেলন, স্বল্পমেয়াদী দানা জাতীয় শস্য, আদা ও হলুদ চাষ করা যেতে পারে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন: মিষ্টি তেঁতুল একটি খরা সহনশীল গাছ। প্রাপ্ত বয়স্ক বা প্রতিষ্ঠিত তেঁতুল গাছে পানি প্রয়োগের তেমন একটা প্রয়োজন হয় না। কিন্তু চারা অবস্থায় মাটির আর্দ্রতার বিশেষ প্রয়োজন হয় বলে ভালভাবে চারা প্রতিষ্ঠার জন্য নার্সারিতে প্রতি ২ সপ্তাহ অন্তর অন্তর পানি দিতে হয়। পানি সব সময় বিকেলে দিতে হয়। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত পানি সেচ দিলে গাছের গোড়ায় পানি আটকে চারা মারাও যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা করতে হবে যাতে অতিরিক্ত পানি নালার মাধ্যমে নিষ্কাশন করা যায়।

পরবর্তী পরিচর্যা

ছাঁটাইকরণ: চারা গাছের ডাল ছাঁটাই অপরিহার্য। গাছ লাগানোর পর থেকে ফল ধরার পূর্ব পর্যন্ত ধীরে ধীরে ডাল ছেঁটে গাছকে নির্দিষ্ট আকার দিতে হবে যাতে গাছ চারিদিকে ছড়াতে না পারে। তারপর নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্তির পর থেকে শুধুমাত্র শুকনা ও মরা পাতা এবং ডাল কাটতে হবে।

রোগ ও পোকার আক্রমণ

মিষ্টি তেঁতুল গাছে রোগ ও পোকামাকড়ের তেমন উপদ্রব লক্ষ্য করা যায় না। তবে মাঝে মাঝে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়।

ফল ছিদ্রকারী পোকা দমন

 ফল সংগ্রহ করার পর পর মৃত, অর্ধমৃত, শুকনা ডালপালা ছাঁটাই করে দিতে হবে।

 পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করতে হবে।

 ফল ধরার পর আক্রমণ শুরু হলে আক্রমণের শুরতেই প্রতিলিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধা ভাঙ্গ নিমের বীজ

সারারাত ভিজিয়ে রেখে সকাল বেলা পুরো গাছে স্প্রে করতে হবে।

 তারপরও আক্রমণ দেখা গেলে সুমিথিয়ন ৫০ইসি ২ মিলি হারে প্রতিলিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফুল আসার সময়: এপ্রিলের শেষের দিকে সাধারণত মিষ্টি তেঁতুল গাছে ফুল আসে।

ফল সংগ্রহ: মিষ্টি তেঁতুলের ফল সংগ্রহের উপযোগী হয় বসন্তের শেষ দিকে এবং গ্রীষ্মের শুরতে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)।

ফলের পরিপক্কতা ও ফলন: মিষ্টি তেঁতুলের সব ফল (পড) একসাথে পরিপক্ক হয় না। তাই হারভেস্টও করতে হয় আলাদা আলাদা সময়ে। সাধারণত গাছ থেকে ফল পাড়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটি পডের বাইরের রং যেন বাদামী বর্ণের হয়। পরিপক্ক ফলের র্ভিতরের পাল্প আঠালো ও বাদামী বা গাঢ় বাদামী রঙের হয় এবং বীজগুলো শক্ত ও চকচকে হয়। আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সম্পূর্ণ পরিপক্ক অবস্থায় মিষ্টি তেঁতুলের পডের বহিঃত্বক খুব সহজেই হাত দিয়ে চাপ দিয়ে ভাঙ্গ যায় এবং চাচ দিলে একটি মচমচে শব্দ হয়। আর পডের ভিতরের পাল্প শুকিয়ে সামান্য কুঁচকে যায়।

ফল সংগ্রহের উপায়/কৌশল: গাছ থেকে পাকা অবস্থায় মিষ্টি তেঁতুল সংগ্রহের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় হলো মই দিয়ে গাছে উঠে একটি একটি করে পাড়া যাতে এর বাইরের ত্বক ভেঙ্গে না যায়। কারণ মিষ্টি তেঁতুলের শেলফ লাইফ মোটামুটিভাবে পুরোটাই নির্ভর করে এর বহিঃত্বক বা খোসার ওপর। কারণ বহিঃত্বক ভেঙ্গে গেলে পড খুব তাড়াতাড়ি ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং উপযুক্ত বাজার মূল্য পাওয়া যায় না।

এ্যাভোকেডো

বারি এ্যাভোকেডো-০১

উচ্চফলনশীল, নিয়মিত প্রচুর ফলদানকারী। ফলের বোঁটার গোড়া সামান্য উচু ও ফল বড় আকারের (প্রতি ফলের গড় ওজন ৫৬২.৩ গ্রাম), ফল দেখতে সবুজ বর্ণের এবং টিএসএস ১৪.৬%। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৭০.৪%। ফলে বেটা ক্যারোটিনের পরিমাণ (৫৪.৩ মা.গ্রাম/ ১০০ গ্রাম) এবং

অসম্পৃক্ত চর্বি ওমেগা-৬ এর পরিমাণ ২০.২%। গাছ প্রতি গড় ফলের সংখ্যা ১৮৯টি এবং গড় ফলন ১০৬.৩ কেজি/গাছ/বছর এবং ১০.৬ টন/হে./বছর।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি উপযোগী। অম্লীয় ও ক্ষারীয় মাটিতে জন্মে থাকে। পিএইচ ৫.০-১০.০। ইহা অধিক বিস্তৃত মাটি যেমন বরেন্দ্র ও পাহাড়ী এলাকায় উৎপাদন করা যেতে পারে।

তাপমাত্রা: এ্যাভোকেডো গাছ নিম্ন তাপমাত্রা থেকে উচ্চ তাপমাত্রায় (৪-৪৫ ডি. সে.) জন্মাতে পারে।

উৎপাদন প্রযুক্তি: এ্যাভোকেডো গাছ সমতল ভুমিতে আয়তাকার পদ্ধতিতে, পাহাড়ী এলাকায় সীমিত ঢালে কন্টুর টেরেস পদ্ধতিতে লাগানো হয়ে থাকে। প্রথমে গভীর চাষ দিয়ে জমি থেকে সমস্ত ধরনের বহুবর্ষজীবি আগাছা ও জঙ্গল পরিস্কার করে নিতে হবে এবং ৬০-৬০-৬০ সেমি আকারের গর্ত তৈরী করতে হবে। প্রতি গর্তে ১০-১৫ কেজি গোবর সার ও ১৫০ গ্রাম টিএসপি সার প্রয়োগ করে চারা রোপণের আগে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে।

চার রোপণ: এ্যাভোকেডো বীজ ও কলমের চারা রোপণ করা হয়। পাকা ফলের রিক্যালসিট্র্যান্ট বীজ আহরণের সাথে সাথেই সীড বেড অথবা পলি ব্যাগের মাটিতে রোপণ করতে হবে। চারার একটা নির্দিষ্ট বয়সে গ্রাফটিং করা হয়।

রোপণ দূরত্ব: সারি থেকে সারি ও চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৮ মি.।

সার প্রয়োগ: সার প্রয়োগ মাটির উর্বরতার উপর নির্ভর করে। গাছের বর্ধনশীল অবস্থায় সাধারণত প্রতি বছর ১৫-২০ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২০০ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ, ১০০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম বোরিক এসিড প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বর্ষার আগে ও পরে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ: সাধারণত এ্যাভোকেডো গাছে সেচ দেয়া হয় কিন্তু ইহা দীর্ঘ খড়া সহ্য করতে পারে। ফলের গুণগত মান উন্নয়ন ও ফলন বৃদ্ধির জন্য শুষ্ক মৌসুমে ২/৩ বার সেচ প্রয়োগ করতে হবে।

গাছের অঙ্গ ছাটাই: গাছের সুন্দর আকার দেয়ার জন্য নীচ থেকে অতিরিক্ত ডাল পালা ছেটে দিয়ে ১-১.৫ মি. উচু ট্রাংক তৈরি করতে হবে। এরপর প্রতিবছর নিয়মিত রোগাক্রান্ত ও অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় ডাল ছেটে দিতে হবে। ফলন্ত গাছে অতিরিক্ত ফল ছিড়ে ফেলে দিতে হবে যাতে ফল বড় হতে পারে।

আন্ত পরিচর্যা: গাছের গোড়া থেকে চতুর্দিকে প্রায় ১ মি. জায়গা সর্বদা পরিস্কার পরিছন্ন রাখতে হবে। আগাছা দমন করতে হবে। মাঝে মাঝে নিড়ানী দিয়ে মাটি আচড়ায়ে দিতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই: সাধারণত বারি অ্যাভোকেডো-১ জাতটিতে কোন রোগ ও পোকামাকড় এর আক্রমণ দেখা যায় না।

ফল সংগ্রহ: ফল বড় হলে আগস্ট মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে।

ফলন: কুড়ি বছরের এ্যাভোকেডো গাছে বছরে ১৮৯টি ফল ধরে যার প্রতিটি ফলের ওজন ৫৬২ গ্রাম এবং প্রতি গাছে ১০৬ কেজি এবং ফলন ১০.৬ টন/হে.।

টমেটো

টমেটো ভিটামিন সমৃদ্ধ একটি শীতকালীন সবজি। বাংলাদেশে ২০১৬-১৭ সালে প্রায় ২৭৬.৬৬ হাজার হেক্টর জমিতে টমেটো চাষ করা হয় এবং মোট ফলন ৩৮৮৭.২৫ হাজার টন। এতে আমিষ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ‘এ’ এবং ভিটামিন ‘সি’ রয়েছে। জাতের প্রকারভেদে টমেটোতে সাধারণত ৩০৫ আইইউ ভক্ষণযোগ্য বিটা ক্যারোটিন রয়েছে।

টমেটোর জাত

বারি টমেটো-২ (রতন)

‘বারি টমেটো-২’ জাতটি বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। গাছের

উচ্চতা ৭৫-৮০ সেমি। ফল গোলাকার। ফলের ওজন ৮৫-৯০ গ্রাম। প্রতিটি গাছে ৩০-৩৫টি ফল ধরে। গাছপ্রতি ফলন ২.০-২.৫ কেজি। চারা লাগানোর ৭৫-৮০ দিনের মধ্যে ১ম বার এবং প্রায় ২০ দিন পর্যন্ত ২-৩ বার ফল সংগ্রহ করা যায়। এ জাতের ব্যাক্টেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধের

ক্ষমতা রয়েছে। জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন হেক্টরপ্রতি ৮০-৮৫

টন হয়। ‘বারি টমেটো-২’ জাত বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষ করা যায়।

বারি টমেটো-১১ (ঝুমকা)

AVWDC হতে প্রাপ্ত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ‘বারি টমেটো-১১’ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। গাছ কম ঝোপালো। ফলের আকার ছোট। ফলের ওজন ৮-১০ গ্রাম। প্রতি গুচ্ছে ১৫-২০টি ফল আঙ্গুরের মত থোকায় থোকায় ধরে। গাছপ্রতি ১৮০-২০০টি ফল ধরে এবং গাছপ্রতি ফলন প্রায়

১ কেজি। চারা লাগানোর ৭০-৭৫ দিন পর ফল পাকতে শুরু করে এবং মাসাধিককাল ফল সংগ্রহ করা চলে। বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই এই জাতটি চাষ করা যায়। চৈত্র-কার্তিক মাসে এ জাতের চারা রোপণ করা হয়। জীবনকাল ১০০-১১০ দিন। ফলন শীত মৌসুমে ৩৫-৪৫ টন/হেক্টর এবং গরম মৌসুমে

২৫-২২ টন/হেক্টর। সারা বছর চাষাবাদযোগ্য। ফল অধিক মিষ্টি। সাধারণ তাপমাত্রায় দুই সপ্তাহ ফল সংরক্ষণ করা যায়।

বারি টমেটো-১৪

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় আবহাওয়ায় উৎপাদন উপযোগী জাত ২০০৭ সালে অনুমোদিত হয়। আগাম এবং শীত পরবর্তী সময়ের জন্য অনুমোদিত। আকর্ষণীয় লাল মাংসল এবং বড় গোলাকার ফল (৯০-৯৫ গ্রাম)। দীর্ঘ সময় সংগ্রহের উপযোগী (৪৫-৬০ দিন)। অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায়। ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী। ফলন ৯০-৯৫ টন/হেক্টর।

বারি টমেটো-১৫

২০০৯ সালে সারা দেশে চাষপোযোগী জাতটি অনুমোদন পায়। উচ্চ ফলনশীল শীতকালীন

জাত। ফলে বীজের সংখ্যা অনেক কম। প্রতিটি গাছে গড়ে ৪০-৪৫টি ফল ধরে। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৬৫-৭০ গ্রাম। চারা লাগানোর ৬০-৭০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে এবং প্রায় ২৫-৩০ দিন ধরে ফল সংগ্রহ করা যায়। ফলের ত্বক পুরু এবং দৃঢ় প্রকৃতির বিধায় অধিককাল সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি হলুদ পাতা কোঁকড়ানো ভাইরাস রোগ সহনশীল। জীবনকাল ১০০-১১০ দিন। ফলন ৮০-৮৫ টন/হেক্টর।

বারি টমেটো-১৬

বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষপোযোগী এ জাতটি ২০১৫ সালে অনুমোদন পায়। উচ্চফলনশীল শীতকালীন জাত। ফল গাঢ় লাল, অনেকটা অর্ধ গোলাকৃতির, তবে ফলে বীজের সংখ্যা অনেক কম। প্রতিটি গাছে গড়ে ৫১-৫৩ টি ফল ধরে। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৭৫-৮০ গ্রাম। চারা লাগানোর ৬০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে এবং প্রায় ২০-২৫ দিন ধরে ফল সংগ্রহ করা যায়। ফলের ত্বক পুরু এবং দৃঢ় প্রকৃতির বিধায় অধিককাল সংরক্ষণ করা যায়। এ জাতটি হলুদ পাতা মোড়ানো ভাইরাস

রোগ সহনশীল। ফলন ৮৫-৯০টন/হেক্টর

বারি টমেটো-১৭

উচ্চ ফলনশীল ভাইরাস প্রতিরোধী জাত। এটি গত ২০১৫ সালে মুক্তায়িত হয়। ৪৫-৪৭ দিনে প্রথম ফুল আসে, ফল বড় আকারের লম্বাটে, লাল রঙের, টিএসএস ৪.৪৫%, যুক্ত আট প্রকোষ্ট বিশিষ্ট ঘন ও দৃড় মাংসল ফল যার ১০০% ভক্ষণযোগ্য। ফলের গড় ওজন ১৮০-১৯০ গ্রাম। প্রতি গাছে ২৩-২৬ টি ফল ধরে। চারা লাগানোর ৬০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে এবং প্রায় ২০-২৫ দিন ধরে ফল সংগ্রহ করা যায়। ফলের ত্বক পুরু এবং দৃঢ় প্রকৃতির বিধায় অধিককাল সংগ্রহ করা যায়। এ জাতটি ব্যাক্টেরিয়াল

উইল্ট এবং হলুদ পাতা মোড়ানো ভাইরাস রোগ সহনশীল।

বারি টমেটো-১৮

উচ্চ ফলনশীল এবং ভাইরাসরোগ ও পোকামাকড় সহনশীল। এ জাতটি ২০১৫ সালে

অবমুক্ত করা হয়। প্রতিটি গাছে গড়ে ফলের সংখ্যা ৩৭টি। এতে লাইকোপেন

এর পরিমাণ বেশি। বীজ বপনের ৮৫-৯০ দিন পর ফসল তোলা যায়। গড় ফলন ৭০-৮০ টন/হেক্টর।

বারি টমেটো-১৯

উচ্চ ফলনশীল এ জাত বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত ১ম প্রক্রিয়াজাত গুণ সম্পন্ন। এ জাতটি ২০১৫ সালে মুক্তায়িত হয়। ৪৪-৪৫ দিনে প্রথম ফুল আসে, ফল মাঝারি আকারের লম্বাটে, লাল রঙের, যুক্ত তিন প্রকোষ্ট বিশিষ্ট মাংসল ফল যার ১০০% ভক্ষণযোগ্য। ফলের গড় ওজন ৬০-৬১ গ্রাম। প্রতি গাছে ৫৮-৬২টি ফল ধরে। গড় ফলন প্রায় ৬৫-৬৭ টন/হেক্টর। প্রক্রিয়াজাতকরণ টমেটো জাত হিসেবে এটি অত্যন্ত ভালো।

বারি টমাটো-২০

বারি টমেটো-২০ চেরি চমেটোর একটি জাত। জাতটি বিটা-ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। এতে ভিটামিন এ আছে ২২৭ মাইক্রোগ্রাম/১০০ গ্রামে। ফল দ্বি-প্রকোষ্ট বিশিষ্ট মাংশাল গাঢ় হলুদ বর্ণের। ফলের গড় ওজন ১৬-১৭ গ্রাম ।টিএসএস ৬.২৪%। প্রতি গাছে ২০০-২২০ টি ফল ধরে । দীর্ঘ সময় প্রায় ৪৫-৫০ দিন পর্যন্ত ফল আহরন করা যায় । প্রতি গাছ থেকে ৫-৬ কেজি টমেটো পাওয়া যায় । হেক্টর প্রতি ফলন ৮০-৮৫ টন। এ জাতটি স্কুল গার্ডেনিং এর জন্য বিশেষ উপযোগী।

বারি টমাটো-২১

বারি টমাটো ২১ জাতটি চাষাবাদের জন্য ২০১৮ সালে অবমুক্ত করা হয়। জাতটি নির্বাচন

প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়েছে। টমাটোর এ জাতটি উচ্চ ফলনশীল এবং শীতকালে চাষ উপযোগী । গাছে আকর্ষণীয় লাল রং এর মাঝারী আকারের oblong ফল ধরে। প্রতি গাছে ৪২-৪৬ টি ফল ধরে। প্রতিটি ফলের ওজন ৯০-৯৩ গ্রাম। সাধারণত বীজ বপনের ৯০-৯৫ দিন পর থেকে টমাটো পাকতে শুরু করে এবং ফল তোলা যায়। এ জাতের টমাটো প্রায় ১ মাস ধরে সংগ্রহ করা যায়। জীবনকাল ১২০-১৫০ দিন। জাতটি ভাইরাস জনিত রোগ এবং ব্যাকটেরিয়া ও ফিউজেরিয়াম জনিত ঢলে পড়া রোগের প্রতি সহনশীল। উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ৮৪-৮৫ টন হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: টমেটো এদেশে শীতকালীন ফসল। উচ্চ তাপমাত্রা এবং বাতাসের আর্দ্রতা টমেটো গাছে রোগ বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার উচ্চ তাপমাত্রা ও শুষ্ক আবহাওয়ায় ফুল ঝরে পড়ে। রাতের তাপমাত্রা ২৩০ সে. এর নিচে থাকলে তা গাছে ফুল ও ফল ধারণের জন্য বেশি উপযোগী। গড় তাপমাত্রা ২০-২৫০ সে. টমেটোর ভাল ফলনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। আলো-বাতাস যুক্ত ঊর্বর দোঁআশ মাটি টমেটো চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল। তবে উপযুক্ত পরিচর্যায় বেলে দোঁআশ থেকে এঁটেল দোঁআশ সব মাটিতেই টমেটো ভাল জন্মে। মাটির পিএইচ ৬ - ৭ হলে ভাল হয়। মাটির

অম্লতা বেশি অর্থাৎ pH কম (৬ এর নীচে) হলে জমিতে চুন প্রয়োগ করা উচিত।

জমি তৈরি: টমেটোর ভাল ফলন অনেকাংশেই জমি তৈরির উপর নির্ভর করে। তাই ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। মাটির প্রকৃতি ও স্থানভেদে ১ মিটার চওড়া ও ১৫-২০ সেমি উঁচু বেড তৈরি করতে হবে।

দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি চওড়া নালা করতে হবে যাতে পানি সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধা হয়।

চারা রোপণ

চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন অথবা ৪-৬ পাতা বিশিষ্ট হলে জমিতে রোপণ করতে হবে।

এক মিটার চওড়া বেডে দুই সারি করে চারা লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূর ৬০ সেমি এবং সারির উপরে চারা থেকে চারা ৪০ সেমি দূরত্বে লাগাতে হবে।

 বীজতলা থেকে চারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে তুলতে হবে যেন চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এ জন্য চারা তোলার আগে বীজতলার মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে চারা রোপণ করাই উত্তম এবং লাগানোর পর গোড়ায় হালকা সেচ প্রদান করতে হবে।

সার প্রয়োগের নিয়ম ও পরিমাণ জমির উর্বরতা শক্তির ওপর নির্ভর করে ভিন্ন হয়ে থাকে। নিচে বিভিন্ন ধরনের সার প্রয়োগের সময় ও পরিমাণ অনুচ্ছেদ আকারে তুলে ধরা হলো:

**ইউরিয়া** সার তিন ধাপে উপরি প্রয়োগ করা হয়। প্রথমবার চারা লাগানোর ১০ দিন পর, দ্বিতীয়বার ২৫ দিন পর এবং তৃতীয়বার ৪০ দিন পর প্রয়োগ করা হয়। জমির উর্বরতা কম হলে প্রতি শতাংশে প্রতিবার ০.৩৬ কেজি, মধ্যম উর্বরতায় ০.২৪ কেজি এবং বেশি উর্বরতায় ০.১২ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হয়।

**টিএসপি** সার জমি তৈরির সময় বেছাল প্রয়োগ করতে হয়। উর্বরতা কম হলে ০.৯১ কেজি, মধ্যম হলে ০.৬১ কেজি এবং বেশি হলে ০.৩০ কেজি টিএসপি প্রতি শতাংশ জমিতে প্রয়োগ করা হয়।

**এমপি** সার বেছালভাবে শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করা হয়, এরপর চারা লাগানোর ২৫ দিন ও ৪০ দিন পর দুই দফা উপরি প্রয়োগ করা হয়। প্রতিবারের জন্য কম উর্বরতায় ০.১৭ কেজি, মধ্যমে ০.১১ কেজি এবং বেশি উর্বরতায় ০.০৬ কেজি এমপি দেওয়া হয়।

**বোরিক অ্যাসিড** জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করা হয়, যেখানে কম ও মধ্যম উর্বরতায় যথাক্রমে ০.০৩ কেজি ও ০.০২ কেজি প্রয়োগ করতে হয়।

**জিপসাম** জমি তৈরির সময় প্রয়োগযোগ্য। প্রতি শতাংশে কম উর্বরতায় ০.৫৪ কেজি, মধ্যমে ০.৩৬ কেজি এবং বেশি উর্বরতায় ০.১৮ কেজি ব্যবহার করা হয়।

**জিংক সালফেট** প্রয়োগ করা হয় জমি তৈরির সময়, যেখানে কম ও মধ্যম উর্বরতায় ০.০৩ কেজি ও ০.০২ কেজি প্রয়োজন।

**পচা গোবর** সার জমি তৈরির সময় বেছাল প্রয়োগ করতে হয়। কম উর্বর জমিতে ৬০ কেজি, মধ্যমে ৪০ কেজি এবং বেশি উর্বর জমিতে ২০ কেজি গোবর প্রয়োগ করা হয় প্রতি শতাংশে।

এইভাবে জমির উর্বরতা বিবেচনায় সঠিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করলে ফসলের বৃদ্ধি ও ফলন উভয়ই উন্নত হয়।

১ শতাংশ = ৪০.০ বর্গ মিটার।

পরবর্তী পরিচর্যা

 সেচ ও নিষ্কাশন: চারা রোপণের ৩-৪ দিন পর পর্যন্ত হালকা সেচ ও পরবর্তীতে প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হয়। গ্রীষ্ম মৌসুমে টমেটো চাষের জন্য ঘন ঘন সেচের প্রয়োজন হয়। বর্ষা মৌসুমে তেমন একটা সেচের প্রয়োজন হয় না। টমেটো গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সেচ অথবা বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য নালা পরিমিত চওড়া (৩০-৪০ সেমি) এবং এক দিকে মৃদু ঢালু হওয়া বাঞ্চণীয়।

 মালচিং: প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে।

 আগাছা দমন: টমেটোর জমিকে প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিয়ে আগছামুক্ত রাখতে হবে।

 সার উপরি প্রয়োগ: সময়মতো বর্ণিত মাত্রায় প্রয়োজনীয় সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

 বিশেষ পরিচর্যা: ১ম ফুলের গোছার ঠিক নিচের কুশিটি ছাড়া সব পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করতে হবে। গাছে বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঠেকনা দিতে হবে।

গ্রীষ্ম ও বর্ষায় চাষ পদ্ধতি

 গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে টমেটো চাষ করার জন্য বারি টমেটো-৪ ও বারি টমেটো-৫ হরমোন সহযোগে আর বারি হাইব্রিড টমেটো-৩, বারি হাইব্রিড টমেটো-৪, বারি হাইব্রিড টমেটো-৮ এবং বারি হাইব্রিড টমেটো-১০ জাতসমূহ হরমোন প্রয়োগ ছাড়া চাষের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে।

 পলিথিনের ছাউনিতে এসব জাতের আবাদ করতে হয়। ২৩০ সেমি চওড়া (মাঝে ৩০ সেমি নালা সহ) ২টি বেডে লম্বালম্বিভাবে একটি করে ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ছাউনির দুপাশে উচ্চতা ১৩৫ সেমি ও মাঝখানের উচ্চতা ১৮০ সেমি হয়ে থাকে।

 চারা লাগানোর পূর্বেই জমিতে নৌকার ছইয়ের আকৃতি করে ছাউনি দিতে হয়। ছাউনির জন্য বাঁশ, স্বচছ পলিথিন, নাইলনের দড়ি ও পাটের সুতলি প্রয়োজন। পলিথিন যাতে বাতাসে উড়ে

না যায় সেজন্য ছাউনির উপর দিয়ে উভয় পার্শ্ব থেকে আড়াআড়ি ভাবে দড়ি পেঁচানো হয়ে থাকে।

 পাশাপাশি দুই ছাউনির মাঝে ৫০ সেমি চওড়া নালা রাখতে হবে যাতে ছাউনি থেকে নির্গত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনসহ বিভিন্ন পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। জমি থেকে বেডের উচ্চতা ২০-২৫

সেমি হতে হবে। প্রতিটি ছাউনিতে ২টি বেডে ৪টি সারি থাকবে। ২৫-৩০ দিন বয়সের চারা প্রতি বেডে ২ সারি করে রোপণ করতে হবে।

 গ্রীষ্মকালীন টমেটো গাছে প্রচুর ফুল ধরলেও উচ্চ তাপমাত্রা পরাগায়নে বিঘ্ন ঘটায়। কাজেই আশানুরূপ ফলন পেতে হলে ‘টমাটোটোন’ নামক কৃত্রিম হরমোন ২০ মিলি ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ছোট সিঞ্চনযন্ত্রের সাহায্যে সপ্তাহে দুই বার শুধুমাত্র সদ্য ফোটা ফুলে ¯স্প্রে করতে হয়।

 তবে নুতন উদ্ভাবিত হাইব্রিড জাতসমূহে হরমোন প্রয়োগ ছাড়াই লাভজনক ফলন পাওয়া যায়।

ফসল তোলা (পরিপক্কতা সনাক্তকরণ): ফলের ঠিক নিচে ফুল ঝরে যাওয়ার পর যে দাগ থাকে ঐ স্থান থেকে লালচে ভাব শুরু হলেই ফল সংগ্রহ করতে হবে বাজার জাতকরণের জন্য। এতে ফল অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

বারি হাইব্রিড টমেটো-৪ (গ্রীষ্মকালীন)

গ্রীষ্মকালীন এ সংকর (হাইব্রিড) জাতের ফল আকারে মাঝারী গোল ও আকষর্ণীয় লাল রঙের। ফলের গড় ওজন ৫০গ্রাম। গাছপ্রতি গড়ে ৩০টি ফল ধরে এবং গাছপ্রতি ফলন প্রায় ১.৫ কেজি। গ্রীষ্ম মৌসুমে ফল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিমহরমোন প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। তবে হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে ফল ধারণ প্রায় দ্বিগুণ করা যায় এবং ফলনও অনেক বৃদ্ধি পায়।

চারা লাগানোর ৬০ দিন পর ফল পাকতে শুরু করে এবং ২০-২৫ দিন ধরে ফল সংগ্রহ করা যায়। ঘরের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ ক্ষমতাও ভাল। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে সারা বছর এই জাতটি

চাষ করা যায়। তবে গ্রীষ্ম-বর্ষাকালের জন্যই এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন ছাউনিতে এর চাষ করা হয়। জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র মাস পর্যন্ত যে

কোন সময় এ জাতের বীজ বপন করা যায়। জীবনকাল প্রায় ৯০ দিন (চারা লাগানোর পর)। ফলন ৪০ টন/হেক্টর।

বারি হাইব্রিড টমেটো- ৫

শীতকালীন হাইব্রিড জাত। বড় চ্যাপ্টা গোলাকৃতির আকর্ষণীয় লাল বর্ণের ফল। প্রতিটি গাছে গড়ে ৩৫-৪০ টি ফল ধরে। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৯৫-১০০ গ্রাম। গাছপ্রতি ফলন গড়ে ৩.৫-৪.০ কেজি। চারা রোপণের ৮০-৯০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে এবং প্রায় ১ মাসব্যাপী ফল সংগ্রহ করা যায়। অধিক সংরক্ষণ গুণসম্পন্ন। ব্যাক্টোরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ এবং পাতা হলুদ পাতা কোকড়ানো ভাইরাস রোগের প্রতি সহনশীল।

বারি হাইব্রিড টমেটো-৮ (গ্রীষ্মকালীন)

উচ্চ তাপমাত্রায় ফুল ও ফল ধারণে সক্ষম। আকর্ষণীয় লাল বর্ণ বিশিষ্ট ত্বক এবং শাস। ফল বেশ মাংসল। প্রতিটি গাছে গড়ে ৪০-৪৫টি ফল ধরে। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৬০-৬৫ গ্রাম। ফলের আকৃতি চ্যাপ্টা গোলাকারধরনের। ফলন ৩৫-৪০ টন/হেক্টর।

বারি হাইব্রিড টমেটো-৯

উচ্চ ফলনশীল শীতকালীন জাত। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সংগ্রহযোগ্য (৪৫-৫৫ দিন)। ৪৭-৫০ দিনে প্রথম ফুল আসে, ফল মাঝারী আকারের গোলাকার, লাল রঙের, টিএসএস ৪.০২%, যুক্ত পাঁচ প্রকোষ্ট বিশিষ্ট মাংসল ফল যার ১০০% ভক্ষণযোগ্য। ফলের গড় ওজন ৯০-৯৫ গ্রাম। প্রতি গাছে ৫০-৫৪ টি ফল ধরে। ফল গোলাকার এবং ফলে বীজের সংখ্যা কম। এ জাতটি টমেটো হলুদ পাতা মোড়ানো ভাইরাস রোগ সহনশীল।

বারি হাইব্রিড টমেটো-১০

বারি হাইব্রিড টমেটো-১০ জাতটি উচ্চ তাপ সহিষ্ণু উচ্চফলনশীল গ্রীষ্মকালীন হাইব্রিড জাত। জাতটি ২০১৭ সালে চাষাবাদের জন্য মুক্তায়িত হয়। গাছে আকর্ষণীয় লাল রঙের মাঝারী আকারের ফল ধরে। গাছ প্রতি গড়ে ফলের সংখ্যা ২৪-২৮টি। প্রতি ফলের ওজন প্রায় ৬৮-৭১ গ্রাম। গ্রীষ্ম মৌসুমে ফল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না তবে হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে ফল ধারণ এবং আকার কিছুটা বাড়ে। ভালভাবে চাষাবাদের

ব্যবস্থা করলে বীজবপনের ৮০-৯০ দিন পর ফসল তোলা যায়। ফসল তোলার

উপযোগী হওয়ার পর প্রায় ৩৫-৪০ দিন পর্যন্ত টমেটো আহরণ করা যায়।

জীবনকাল ১১০-১২০ দিন। জাতটি ভাইরাস জনিত রোগ প্রতিরোধী এবং ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগের প্রতি সহনশীল। উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে ফলন গ্রীষ্মকালে হেক্টর প্রতি প্রায় ৪৮-৫১ টন হয়। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে সারা বছর এই জাত টি চাষ করা যায় তবে গ্রীষ্ম বর্ষা কালের জন্যই এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমে পলিথিনের ছাউনিতে চাষ করতে হয় এবং বর্ষা মৌসুমে মূল্য বেশি থাকে বলে এ জাতের টমেটো চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যায়।

বারি হাইব্রিড টমেটো-১১

গ্রীষ্মকালীন এই হাইব্রিড জাতটি চাষাবাদের জন্য বারি হাইব্রিড টমেটো-১১ হিসেবে ২০১৮ সালে অবমুক্ত করা হয়। টমেটোর এ জাতটি উচ্চ ফলনশীল এবং উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে। গাছে আকর্ষণীয় লাল রঙের মাঝারী আকারের অবলং ফল ধরে। প্রতি গাছে ২০-২৫ টি ফল ধরে। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৭৫-৮০ গ্রাম। গ্রীষ্ম মৌসুমে ফল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না তবে হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে ফলের ধারণ এবং আকার কিছুটা বৃদ্ধি পায়। সাধারণত বীজ বপনের ৯০-৯৫ দিন পর থেকে টমেটো পাকতে শুরু করে এবং ফসল তোলা যায়। এ জাতের টমেটো মাসাধিক কাল ধরে সংগ্রহ করা যায়। জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন। জাতটি টমেটোর দাগ যুক্ত ঢলে পড়া টমেটোর হলুদ পাতা কুঁকড়ানো ভাইরাস এবং ঢলে পড়া জনিত রোগের প্রতি সহনশীল। উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে ফলন গ্রীষ্মকালে হেক্টরপ্রতি প্রায়

৪৮-৫০ টন হয়। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে সারা বছর এই জাতটি চাষ করা যায় তবে গ্রীষ্ম

বর্ষা কালের জন্যই এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। গ্রীষ্মবর্ষা মৌসুমে পলিথিনের ছাউনি তে

চাষ করতে হয় এবং বর্ষা মৌসুমে মূল্য বেশি থাকে বলে এ জাতের টমেটো চাষ করে অধিক

লাভবান হওয়া যায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: টমেটো এ দেশে শীতকালীন ফসল তবে কিছু কিছু জাত গ্রীষ্মকালেও চাষ করা যায়। উচ্চ তাপমাত্রা ও

শুষ্ক আবহাওয়ায় টমেটোর ফুল ঝরে পড়ে। টমেটোর ভাল ফলনের জন্য তাপমাত্রা ২০-২৫০ সে. উত্তম। সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটি টমেটো চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। বারি হাইব্রিড টমেটো-৫, বারি হাইব্রিড টমেটো-৯ শীতকালে এবং বারি হাইব্রিড টমেটো-৪, বারি হাইব্রিড টমেটে-৮, বারি হাইব্রিড টমেটো-১০ ও বারি হাইব্রিড টমেটো-১১ বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে চাষ উপযোগী।

বীজ বপনের সময় : শীতকালে অক্টোবর-নভেম্বর (আশ্বিন-কার্তিক) এবং গ্রীষ্মকালে এপ্রিল-জুন (বৈশাখ-আষাঢ়)

জমি তৈরি : টমেটোর ভাল ফলন অনেকাংশে জমি তৈরির ওপর নির্ভর করে। তাই ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। মাটির প্রকৃতি ও স্থান এবং রোপণকাল ভেদে ২০-৩০ সেমি চওড়া নালা রাখতে হবে। এত অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতজনিত পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হতে পারে এবং প্রয়োজনে সেচ দেয়ার সুবিধা হয়। কম বৃষ্টিপাত এলাকায় বা বর্ষার আগে ও শীতের আগে খোলা মাঠে চাষের ক্ষেত্রে এইভাবে জমি তৈরি করতে হবে।

পলিথিন ছাউনি : ভরা বর্ষা মৌসুমে লাগানো চারার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পরবর্তী সময় ভাল ফলনের নিশ্চয়তার জন্য বেডে বা মিড়িতে নৌকার ছইয়ের আকৃতি করে স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ছাউনি দিতে হবে। ২৩০ সেমি চওড়া (মাঝে ৩০ সেমি নালাসহ) দুটি মিড়িতে লম্বালম্বিভাবে ১টি করে ছাউনির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ছাউনির উচ্চতা হবে দুপাশে ৪.৫ ফুট বা ১৩৫ সেমি ও মাঝখানে ৬ ফুট বা ১৮০ সেমি দু’টি ছাউনির মাঝে অন্তত ৫০ সেমি চওড়া নালা রাখতে হবে

যাতে করে ছাউনি থেকে নির্গত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনসহ বিভিন্ন পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। পলিথিন ছাউনি লম্বায় জমির আকার আকৃতির ওপর নির্ভর করে কমবেশি হতে পারে কিন্তু চওড়া (বাজারে প্রাপ্ত পলিথিনের সর্বোচ্চ চওড়া অনুযায়ী) ২.৩ মিটার হওয়া বাঞ্ছনীয়। ছাউনি ২০ মিটার লম্বা হলে প্রতি হেক্টরে এ ধরনের প্রায় ১৭০টি ছাউনি প্রয়োজন হতে পারে।

বীজ শোধন : কেজিপ্রতি ২ গ্রাম ভিটাভেক্স/অটোস্টিন দিয়ে টমেটোর বীজ শোধন করতে হবে। বীজ শোধন করলে বীজবাহিত রোগ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

চারা উৎপাদন : সুস্থ ও সবল চারা উৎপাদনের জন্য প্রথমে ৯-১০ গ্রাম পরিপক্ক ও রোগমুক্ত বীজ ঘন করে ৩ মি.X ১মি. আকারের বীজতলায় বুনতে হবে। এই হিসেবে প্রতি হেক্টরে ২০০ গ্রাম (১ গ্রাম প্রতি শতাংশ) বীজ বুনতে হয়। গজানোর ৮-১০ দিন পর চারা দ্বিতীয় বীজতলায় ৪ X ৪ সেমি দূরত্বে স্থানান্তর করতে হবে। এক হেক্টর জমিতে টমেটো চাষের জন্য এইরূপ ২২টি বীজতলার প্রয়োজন হয়।

সার প্রয়োগ : ভাল ফলন পাওয়ার জন্য জমিতে সুষম সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সারের মাত্রা জমির ঊর্বরতার ওপর নির্ভরশীল। মধ্যম ঊর্বর জমিতে প্রতি শতাংশে নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করা হয়।

সারের প্রয়োগ (কেজি/শতাংশ)

শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর/কম্পোস্ট, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট, বরিক এসিড এবং অর্ধেক এমপি সার জমিতে ভালভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক এমপি সার দুই কিস্তেতে চারা লাগানোর ২৫ দিন ও ৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে চারা লাগানোর ১০, ২৫ ও ৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। উপরি প্রয়োগকৃত ইউরিয়া এবং এমপি সার গাছের গোড়ায় ১০-১৫ সেমি দূরে মাটির সঙ্গে

ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে।

চারা রোপণ : চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে বীজতলা থেকে উঠিয়ে মূল জমিতে রোপণ করতে হবে। এক মিটার চওড়া বেডে দুই সারি করে চারা লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব হবে ৪০ সেমি। বীজতলা থেকে চারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে তুলতে হবে যেন চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। বিকেলের পড়ন্ত রোদে চারা রোপণ করাই উত্তম। লাগানোর পর গোড়ায় হালকা সেচ প্রদান করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা :

১. সেচ ও নিষ্কাশন: চারা রোপণের পর ৩-৪ দিন পর্যন্ত হালকা সেচ ও পরবর্তী সময় প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হয়। টমেটো গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সেচ অথবা বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য ৩০-৪০ সেমি চওড়া নালা এবং এক দিকে সামান্য ঢালু হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২. নিড়ানী দেয়া: প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে।

৩. আগাছা দমন: টমেটোর জমিকে প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিয়ে আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৪. বিশেষ পরিচর্যা: ১ম পুষ্পমঞ্জুরীর ঠিক নিচের কুশিটি ছাড়া নিচের সব পার্শ্বকুশি ছাঁটাই করতে হবে। গাছে বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঠেকনা দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ : ফলের নিচের ফুল ঝরে যাওয়ার পর যে দাগ থাকে ঐ স্থান থেকে লালচে ভাব শুরু হলেই বাজারজাতকরণের জন্য ফল সংগ্রহ করতে হবে। এরূপ ফল সংগ্রহ করলে অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

বেগুন

বেগুন বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় সবজি। সারা বছরই এর চাষ করা যায়। তবে শীত মৌসুমে ফলন বেশি হয়। এ দেশে বহু জাতের স্থানীয় বেগুন রয়েছে। তবে ফলনের দিক থেকে এদের কোনটিই তেমন উচ্চ ফলনশীল নয়। স্থানীয় জাতের ব্যাপক জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে বাছাই

প্রক্রিয়া, সংকরায়ণ ও জিন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বেগুনের জাত

বারি বেগুন-১ (উত্তরা)

‘বারি বেগুন-১’ জাতটি ১৯৮৫ সালে উত্তরা নামে অনুমোদন করা হয়। এ জাতের গাছ

খাটো ও ছড়ানো। পাতা ও শাখার রং হালকা বেগুনী। ফল সরু, ১৮-২০ সেমি

ত্বক পাতলা, শাঁস নরম। চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ শুরু হয় এবং

৩-৪ মাস পর্র্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়। প্রতিটি গাছে ৫০-৫৫টি ফল ধরে। গাছে গুচ্ছাকারে

ফল ধরে। এ জাতের গাছের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম

হয়। জীবনকাল ১৬০-১৭০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৫০-৫৫

টন হয়। শীতকালে বাংলাদেশের সর্বত্র এ জাতের চাষ করা যায়। আগাম জাত হিসেবেও

উত্তরা বেগুন চাষ করা যায়।

বারি হাইব্রিড বেগুন-২ (তারাপুরী)

‘বারি হাইব্রিড বেগুন-২’ একটি উচ্চ ফলনশীল সংকর জাত। ১৯৯২ সালে জাতটি তারাপুরী

নামে অনুমোদিত হয়। ফল কালচে বেগুনী রঙের এবং বেলুনাকৃতির। ফলের ত্বক পাতলা, শাঁস

নরম। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৪০-৪৫টি। ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী।

এ জাত উচ্চ ফলনশীল। জীবনকাল ১৮০-১৯০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৫৫-৬০ টন হয়। শীতকালে বাংলাদেশে সর্বত্র এ জাতের চাষ করা যায়।

বারি বেগুন-৪ (কাজলা)

সংকরায়ণ ও পরবর্তী সময়ে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি বেগুন-৪’ জাতটি ১৯৯৮ সালে ‘কাজলা’ নামে অনুমোদন করা হয়। উচ্চ ফলনশীল এ জাতের ফলের আকার মাঝারী ,রং কালচে বেগুনী ও চকচকে। কাজলা জাতের গাছের আকৃতি মাঝারী ছড়ানো। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৫০-৫৫টি। প্রতি ফলের ওজন ৯০-১০০ গ্রাম।বীজ লাগানোর ৯০-৯৫ দিন পর ফল ধরে এবং ১৯০ দিন অর্থাৎ আশ্বিন-চৈত্র মাস ফল পাওয়া যায়। কাজলা বেগুনের

ফলন হেক্টরপ্রতি ৫০-৫৫ টন হয়।

বারি বেগুন-৫ (নয়নতারা)

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি বেগুন-৫’ জাতটি ১৯৯৮ সালে ‘নয়নতারা’

নামে অনুমোদন করা হয়। এ জাত উচ্চ ফলনশীল। এ জাতটির গাছ খাড়া

আকৃতির। ফল গোলাকৃতি, রং উজ্জ্বল কালচে বেগুনী। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা

৩০-৩২টি এবং প্রতিটি ফলের ওজন ১৫০-১৬০ গ্রাম। এ জাতটি অন্যান্য জাতের

তুলনায় আগাম ফলন দেয়। আশ্বিন মাসে (মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-অক্টোবর)

চারা রোপণ করলে চৈত্র মাস (মধ্য-মার্চ থেকে মধ্য-এপ্রিল) পর্র্যন্ত ফল সংগ্রহ করা

যায়। এই জাতটি বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতে ও জলবায়ুতে চাষ করা যায়। ভাদ্র-অগ্রহায়ণ (শীতকাল) মাসে এ জাত রোপণ করা হয়। বীজ বপনের ৯০-১০০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ শুরু হয় এবং ১৬০-১৮০ দিন পর্র্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। ফলন ৪৫-৫০ টন/হেক্টর।

বারি বেগুন-৬

এ জাতটির গাছ মাঝারী আকৃতির ঝোপালো। হালকা সবুজ রঙের ফল ডিম্বাকৃতির

ও গাছপ্রতি গড় ফল সংখ্যা ২০-২২টি, ৮-৯ সেমি এবং ব্যাস ৭-৮ সেমি।

প্রতি ফলের গড় ওজন ২০০-২২৫ গ্রাম। জাতটি সারা বছর চাষ করা যায় তবে শীতকালে এর ফলন বেশি হয়। এই জাতটি বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতে ও জলবায়ুতে চাষ করা যায়। এ জাতের রোপণ সময় ভাদ্র-অগ্রহায়ণ (শীতকালে) ও ফাল্গুন-বৈশাখ (গ্রীষ্মকালে)। বীজ বপনের

৯০-১০০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ শুরু হয় এবং ১৭০-১৯০ দিন পর্র্যন্ত সংগ্রহ

করা যায়। ফলন ৪৫-৫০ টন/হেক্টর (শীতকালে)।

বারি বেগুন-৭

উচ্চ ফলনশীল জাতটির গাছ খাড়া আকৃতির। ফলের আকার চিকন এবং রং চকচকে গাঢ় বেগুনী। গাছপ্রতি গড় ফল সংখ্যা ৩০-৩৫টি ও ফল লম্বায় ২৫-২৭ সেমি। প্রতি ফলের গড় ওজন ১১০-১২০ গ্রাম। সারা বছর চাষ করা যায় তবে শীতকাল এ জাতটির প্রকৃত মৌসুম। বীজ বপনের ৯০-১০০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়। জাতটি বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতে ও সব এলাকায় চাষ করা যায়। এ জাতের রোপণ কাল ভাদ্র-অগ্রহায়ণ (শীতকালে) ও ফাল্গুন-বৈশাখ (গ্রীষ্মকালে)। ফলন ৪০-৪৫ টন/হেক্টর (শীতকালে) ও ২৫ টন/হেক্টর (গ্রীষ্মকালে)।

বারি বেগুন-৮

উচ্চ ফলনশীল গ্রীষ্মকালীন এ জাতটির গাছ খাড়া আকৃতির। ফলের আকার লম্বাকৃতি,

চিকন এবং রং উজ্জ্বল কালচে বেগুনী। গাছপ্রতি গড় ফল সংখ্যা ৩০-৩৫টি ও লম্বায়

২৫-৩০ সেমি। প্রতি ফলের গড় ওজন ১১৫-১২০ গ্রাম।

জাতটি সারা বছর চাষ করা যায়। দেশের সর্বত্র এটি চাষ করা যায়। ফলন ৪৫-৫০

টন/হেক্টর (শীতকালে) ও ২৫-৩০ টন/হেক্টর (গ্রীষ্মকালে) জাতটি ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে

পড়া ও কৃমি রোগ প্রতিরোধী।

বারি বেগুন-৯

এ জাতটির গাছ মাঝারী আকৃতির, ঝোপাল ও কিছুটা খ্াজকাটা পাতা বিশিষ্ট।

ডিম্বকৃতির ও উজ্জ্বল সবুজ রঙের। ফলের নিচের অংশে সাদা সাদা লম্বাটে দাগ

থাকে। প্রতি গাছে গড় ফল সংখ্যা ৩০-৩৫টি এবং ফলের গড় ওজন ১৩০-১৪০

গ্রাম। ফলন প্রতি হেক্টরে ৪২-৪৫ টন। এ জাতের বেগুন ঢলে পড়া, কৃমি ও শিকড়

পচা রোগ সহনশীল।

বারি বেগুন-১০

এ জাতটির গাছ মাঝারী আকৃতির ঝোপালো। ফলের রং উজ্জ্বল গাঢ় বেগুনী এবং

নলাকৃতির। গাছপ্রতি গড় ফল সংখ্যা ২৫-৩০টি ও লম্বায় ২৫-৩০ সেমি, প্রতিফলের গড় ওজন

১২০-১৩০ গ্রাম। তাপ সহিষ্ণু হওয়ায় সারা বছর চাষ করা যায়। তবে শীতকালে ভাল ফলন হয়।

প্রতি হেক্টরে ফলন ৪৫-৫০ টন। ফলন ২৫-৩০ টন।

বারি হাইব্রিড বেগুন-৩

‘বারি হাইব্রিড বেগুন-৩’ জাতটি বাংলাদেশে শীতকালে চাষাবাদের উপযোগী। এ জাতটি বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতে ও জলবায়ুতে চাষ করা যায়। এ জাতটির গাছ মাঝারী আকৃতির, ঝোপালো ও খাঁজকাটা পাতা বিশিষ্ট।

বীজ বপনের ৯০-১০০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ শুরু হয় এবং ১৭০-১৮০ দিন

পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। ফল লম্বাটে, নল আকৃতির ও গাড় বেগুনী রঙের। প্রতি গাছে গড়

ফল সংখ্যা ৫০-৫৫ এবং ফলের গড় ওজন ১০০-১১০ গ্রাম। গড় ফলন ৫৫-৬০

টন/হেক্টর। এ জাতের বেগুন ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।

বারি হাইব্রিড বেগুন-৪

এ জাতটির গাছ মাঝারী আকৃতির এবং ঝোপালো প্রকৃতির। ‘বারি হাইব্রিড বেগুন-৪’ বাংলাদশে

শীতকালে চাষাবাদ উপযোগী। ফল হালকা সবুজ ও ডিম্বাকৃতির। গাছপ্রতি গড় ফল সংখ্যা ৪৫-৫০ এবং ফলের গড় ওজন ১১০-১২০ গ্রাম। গড় ফলন ১৬০-১৮০ টন/হেক্টর। এ জাতের বেগুনের জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন এবং এ জাতের বেগুন ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও জলবায়ু : আমাদের দেশের সব রকমের মাটিতে বেগুন চাষ করা যায় এবং ভাল ফলনও দিয়ে থাকে। তবে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটিই এর চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। বেগুনের জন্য দীর্ঘ

লম্বা সময়ব্যাপী নিম¥ তাপমাত্রা (১৫-২৫০ সে.) সবচেয়ে উপযোগী। উচ্চ তাপমাত্রায় বেগুনের ফুল ও ফল উৎপাদন বিঘ্নিত হয় এবং এসময় অনিষ্টকারী পোকার আক্রমণ বেশি হয়। সে জন্য গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমে এর উৎপাদন তত ভাল হয় না। তাই শীতকালই বেগুন চাষের উপযুক্ত সময়। তবে কিছু উচ্চ তাপমাত্রা সহিষ্ণুজাত গ্রীষ্মকালে ভাল ফলন দিয়ে থাকে। বারি বেগুন-৮ এবং বারি বেগুন-১০ গ্রীষ্মকালে চাষের উপযোগী।

বীজের হার : অঙ্কুরোদ্গমের হার ৮০% বিবেচনায় বীজের পরিমাণ ২০০-২৫০ গ্রাম/হেক্টর

বীজ বাছাই : বেগুনের বীজ বপনের পূর্বে ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেয়া প্রয়োজন। ভাল ও বিশুদ্ধ বীজের অভাবে নির্দিষ্ট জাতের গুণাগুণ সম্পন্ন বেগুনের উচ্চ ফলন আশা করা যায় না। তাই অপুষ্ট, ভাঙ্গা ও অন্য শষ্যের বীজ থাকলে তা বাছাই করা জরুরি।

বীজ শোধন : বীজতলায় বপনের পূর্বে বেগুনের বীজকে রাসায়নিক ঔষধ (প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ বা ক্যাপটান) ব্যবহার করে ভালোভাবে ঝাকিয়ে বীজ শোধন করা। বীজ শোধনের ফলে বেগুনের এ্যানথ্রাকনোজ, লিফস্পট, ব্লাইট ইত্যাদি রোগ ও বপন পরবর্তী সংক্রামণ রোধ সম্ভব হয়।

বীজতলা তৈরি ও পরিচর্যা :

 দোআঁশ মাটি, বালি ও পচা গোবর সার বা কম্পোস্ট মিশিয়ে বীজতলার মাটি তৈরি করতে হয়।

 বীজতলা সাধারণত এক মিটার চওড়া ও তিন মিটার লম্বা হবে। জমির অবস্থা ভেদে দৈর্ঘ্য বাড়ানো কমানো যেতে পারে।

 বীজতলায় সারিতে বীজ বপন করা উত্তম। সারিতে বপনের জন্য ৫ সেমি দূরত্বে ক্ষুদ্র নালা/সারি তৈরি করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

 চারা গজানোর পর থেকে ১০-১২ দিন পর্যন্ত হালকা ছায়া দ্বারা যেমন- চাটাই দ্বারা ঢেকে অতিরিক্ত সূর্যতাপ থেকে চারা রক্ষা করা প্রয়োজন।

 মূল জমিতে চারা লাগানোর পূর্বে বীজতলা থেকে তুলে ১০-১২ দিনের চারা দ্বিতীয় বীজতলায় দ্বিতীয় বীজতলায় ৫ সে.মি ৪ সে. দূরে লাগাতেহয়। স্থানান্তরিত করা হলে চারার শিকড় বিস্তৃত ও শক্ত হয়, চারা অধিক সবল ও তেজী হয়।

 চারা লাগানোর পর হালকা পানি দিতে হবে এবং বৃষ্টির পানি ও প্রখর রোদ থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন বা চাটাই দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।

বীজতলায় বীজ বপনের সময় : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (শীতকালে), মার্চ (গ্রীষ্মকালে)

চারার বয়স :

 চারার বয়স ২৫-৩০ দিন অথবা ৪-৬ পাতা বিশিষ্ট হলে জমিতে রোপণ করতে হবে।

 বীজতলা থেকে চারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে তুলতে হবে যেন চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এ জন্য চারা তোলার আগে বীজতলার মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে। চারা রোপণ করার পর গোড়ায় হালকা সেচ প্রদান করতে হবে।

চারার সংখ্যা : চারার সংখ্যা অনেকাংশেই জমিতে রোপণ দূরত্বের উপর নির্ভর করে। রোপণ দূরত্ব ১২০X৭০ সেমি হলে হেক্টর প্রতি ১১,৯০০ টি চারার প্রয়োজন হয়।

চারা রোপণ দূরত্ব : রোপণের দূরত্ব নির্ভর করে জাতের উপর। ছড়ানো জাতের জন্য বেশি দূরত্ব প্রয়োজন হয়, খাড়া জাতের জন্য কম দূরত্ব প্রয়োজন হয়। সাধারনত ৭০ সেমি প্রশস্ত বেডে এক সারিতে চারা রোপণ করা হয়। দুইটি বেডের মাঝে ৫০ সেমি প্রশস্ত নালা থাকে। সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ৭০ সেমি।

জমি তৈরি : ৪-৫টি চাষ দিয়ে এমন ভাবে জমি তৈরি করতে হয় যাতে জমিতে মাটির ঢেলা না থাকে। বেডে চারা রোপণই উত্তম।

জমির নকশা

বেডের আকার প্রস্থ : ৭০ সেমি

দৈর্ঘ্য : জমির দৈর্ঘের উপর নির্ভর করবে

নালার আকার প্রস্থ : ৫০ সেমি

গভীরতা : ২০ সেমি

সুতরাং রোপণ দূরত্ব : ১২০X৭০ সেমি

ফসল উৎপাদনে সঠিক সময় ও পরিমাণে সার প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক হেক্টর জমির জন্য সার প্রয়োগের নিয়ম হলো—**গোবর বা কম্পোস্ট** ১০,০০০ কেজি প্রয়োগ করা হয়, যার মধ্যে ৫,০০০ কেজি শেষ চাষের সময় এবং বাকি ৫,০০০ কেজি গর্তে প্রয়োগ করা হয়।

**ইউরিয়া** সার গর্তে প্রয়োগ না করে চারা লাগানোর ১৫ দিন পর, ফুল ধরার শুরু, ফল ধরার শুরু এবং ফল আহরণের সময়—এই চার ধাপে ৬০ কেজি করে মোট ২৪০ কেজি প্রয়োগ করা হয়।

**টিএসপি** মোট ২৫০ কেজি প্রয়োগ করা হয়, যার অর্ধেক (১২৫ কেজি) শেষ চাষের সময় এবং বাকিটা গর্তে প্রয়োগ করা হয়।

**এমওপি** সার মোট ২০০ কেজি প্রয়োগ করা হয়, এর মধ্যে ৫০ কেজি গর্তে এবং বাকি অংশ তিন ধাপে প্রয়োগ করা হয়—ফুল ধরার সময় ৪৫ কেজি, ফল ধরার সময় ৫২.৫ কেজি এবং ফল আহরণের সময় ৫২.৫ কেজি।

**জিপসাম** ১০০ কেজি প্রয়োগ করা হয়, যা সম্পূর্ণ শেষ চাষের সময় ব্যবহার করা হয়।

**বোরিক অ্যাসিড (বোরন)** ১০ কেজি প্রয়োগ করা হয়, সাধারণত জমি প্রস্তুতির সময়।

এইভাবে সময়ানুযায়ী ও পরিমাণমতো সার প্রয়োগ করলে ফসলের সুষম পুষ্টি নিশ্চিত হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

 শেষ চাষের সময় অর্ধেক গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি এবং সবটুকু জিপসাম ও বোরিক এসিড সার জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

 বাকি অর্ধেক গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি এবং ৩৫-৪২.৫ কেজি এমপি সার চারা লাগানার ৭দিন পূর্বে গর্তে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

 সম্পূর্ণ ইউরিয়া (৫টি কিস্তিতে) ও বাকি এমপি সার (প্রথম ৩টি কিস্তিতে) যথাক্রমে চারা লাগানো ১৫ দিন পর, ফুল ধরা আরম্ভ হলে, ফল ধরা আরম্ভ হলে, ফল আহরণের সময় ২ বার সমভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

খুঁটি দেওয়া ও পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করা : গাছে বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঠেকনা দিতে হবে। গাছে ১ম ফুলের ঠিক নিচের কুশিটি ছাড়া সব পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা : জমিকে প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিয়ে আগছামুক্ত রাখতে হবে। প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে। প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিলে মাটিত শিকড়ের বৃদ্ধি ভাল হয়

সেচ : চারা রোপণের ৩-৪ দিন পর পর্যন্ত হালকা সেচ ও পরবর্তীতে প্রতি কি¯স্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হয়। গ্রীষ্ম ও শীত মৌসুমে চাষের জন্য ঘন ঘন সেচের প্রয়োজন হয়। বর্ষা মৌসুমে তেমন একটা সেচের প্রয়োজন হয় না। বেগুন গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। বেডের দুপাশের নালা দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া সুবিধাজনক। খরিফ মৌসুমে জমিতে পানি যাতে না জমে সেজন্য পানি নিষ্কাশনের জন্য জমির চারপাশে নালা রাখতে হবে।

পোকা মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন প্রকার পোকা ও মাকড় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেগুন উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে। এদের মধ্যে সাদামাছি, এফিড, থ্রিপস, পাতার হপার পোকা, কাঁটালে পোকা এবং মাকড় অন্যতম।

বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা দমন ব্যবস্থাপনা : কচি ডগা ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে যায়। বেগুনের বোঁটার নিচে ছোট ছিদ্র দেখা যায়। আক্রান্ত ফলের ভিতরটা ফাঁপা ও পোকার বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ থাকে।

পোকা আক্রান্ত ডগা ও ফল ধ্বংস করা : কীড়া সমেত আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করা।

সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার : সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব।

পরজীবি ও পরভোজী পোকা ব্যবহার করা : ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার পরজীবি পোকা যেমন- ট্রাথালা ফ্লেভো- অরবিটালিস ও পরভোজী পোকা যেমন- ম্যনটিড, এয়ার-উইগ, পিঁপড়া, লেডি বার্ড বিটেল, মাকড়সা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বেগুনের জমিতে এরা প্রচুর পরিমাণে ডগা ও ফলছিদ্রকারী পোকাই কেবল ধ্বংস করে না সাথে সাথে অন্যান্য ক্ষতিকারক পোকা যেমন- জ্যসিড, সাদা মাছি ইত্যাদির সংখ্যা স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখতে সাহায্য করে।

বিষাক্ত কীটনাশকের প্রয়োগ বন্ধ বা সীমিত ব্যবহার : একান্ত প্রয়োজনে কেবলমাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক (ট্রেসার প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি) ব্যবহার করা যেতে পারে।

সাদা মাছি দমন ব্যবস্থাপনা

বীজতলার চারা সূক্ষ্ম নেটের দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। এর ফলে চারাগুলি সাদামাছির আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকবে।ফসলের অবশিষ্টাংশ নষ্ট করে ফেলতে হবে এবং আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। নিম বীজ ভিজানো পানি (প্রতি লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধ ভাঙ্গা নিম বীজ ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে) প্রয়োগ করতে হবে।আঠালো হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। আক্রমণের শুরুতে বায়োনিম প্লাস ১মিলি/ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে

করতে হবে।আক্রমণের শুরুতে Difenthiuron গ্রুপ এর কীটনাশক @ ১ মিলি/ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে করতে

থ্রিপস দমন ব্যবস্থাপনা

 সঠিকভাবে সেচ প্রদান করতে হবে। কারণ, পোকার রস শোষণের ফলে ক্রমান্বয়ে গাছের কোষ থেকে পানি বের হয়ে পানি শূন্যতার সৃষ্টি হয়। সেচ বা জমি ভিজিয়ে দিলে মাটিতে বিদ্যমান থ্রিপসের প্রিপিউপা ও পউপা মারা যায়।

মাঠে অনাকাঙ্ক্ষিত গাছ তুলে ফেলতে হবে এবং আগাছা দমন করতে হবে।ফসলের ক্ষেতে সাদা আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।আক্রমণের শুরুতে সাকসেস ২.৫ এস সি প্রতি লিটার পানিতে ১.২ মিলি মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করতে হবে অথবা আক্রমণের শুরুতে ইনটিপ্রিড ১০ এস সি প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি

মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করতে হবে।

জাব পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

 সংগ্রহের পর ফসলের অবশিষ্টাংশ নষ্ট করা।

 আঠালো হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

 বায়োনিম প্লাস ১ মিলি/ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে করতে হবে।

 সুমিথিয়ন ৫০ ইসি বা ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি বা ফাসটাক ২ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি অথবা এসাটাফ ৭৫ ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম বা এডমায়ার ২০০ এসএল প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করতে হবে।

পাতার হপার পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

 ফসলের অবশিষ্টাংশ নষ্ট করা এবং আগাছা পরিষ্কার।

 ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানি (৫ গ্রাম/ লিটার) পাতার নিচের দিকে স্প্রে।

 আক্রমণের শুরুতে বায়োনিম প্লাস ১মিলি/ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে

করতে হবে।

 আক্রমণের শুরুতে গ্রুপ এর কীটনাশক @ ১মিলি/ লিটার অথবা ইনটিপ্রিড ১০ এস সি

প্রতি লিটার পানিতে ১মিলি মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে করতে হবে।

কাঁটালে পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

 আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় ডিমের গাদা, লার্ভা, পিউপা ও পূর্ণবয়স্ক পোকা হাত দ্বারা ধ্বংস করতে হবে।

 ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

 জমি, জমির আইল, সেচ নালা আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

 আক্রান্ত ফসলে উপরি সেচ প্রয়োগ করতে হবে। ধুলাবালি থাকলে এদের আক্রমণ বেড়ে যায়। ভারী বৃষ্টিপাতে মাইটের আক্রমণ কমে যায়।

 মাকড় নাশক অনধসবপঃরহ (ভার্টিমেক ১.৮ ইসি অথবা অনড়স ১.৮ ইসি )প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন প্রকার রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিম্নে প্রধান কয়েকটি রোগ নিয়ে আলোচনা করা হলো:

ডেম্পিং অফ দমন ব্যবস্থাপনা

 বীজ তলায় এ রোগ হয়; প্রতিষেধক হিসেবে মাটিতে কপার বা ডায়থেন এম-৪৫ ১-২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজতলার মাটি ভাল করে ভিজিয়ে কয়েকদিন পর বীজ বপন করতে হবে।

 বপনের পূর্বে প্রভেক্স, ভিটাভেক্স (২.৫ গ্রাম/ কেজি বীজ) দ্বারা বীজ শোধন করতে হবে।

কাণ্ড ও ফল পচা দমন ব্যবস্থাপনা

 সুস্থ-রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করা।

 ফসল সংগ্রহের পর মুড়ি গাছ না রেখে সমস্ত গাছ, ডালপালা, পাতা ইত্যাদি একত্রে পুড়িয়ে ে ফলা।

 রোগ কাণ্ডে দেখা দিলে গাছের গোড়াসহ মাটি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অটোস্টিন বা নোইন মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ঢলে পড়া রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

 আক্রান্ত গাছ দেখলেই প্রাথমিকভাবে তা তুলে ধ্বংস করতে হবে।

 রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ করা এবং আক্রান্ত জমিতে শস্য পর্যায় অনুসরণ করতে হবে।

 পরিমাণমতো সেচ দিতে হবে।

 স্টেবল ব্লিচিং পাউডার ২০-৩০ কেজি প্রতি হেক্টরে চারা লাগানোর পূর্বে জমিতে প্রযোগ করা।

গুচ্ছপাতা দমন ব্যবস্থাপনা

 ফাইটোপ্লাজমা দ্বারা এ রোগ হয়। আক্রান্ত গাছ দেখলেই প্রাথমিকভাবে তা তুলে ধ্বংস করা।

 ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করা।

 ক্ষেতে পাতার হপার পোকার উপস্থিতি দেখা দিলে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করে তা দমন করা।

স্কেøরোটিনিয়া রট দমন ব্যবস্থাপনা

 সুস্থ বীজতলা হতে চারা সংগ্রহ করা।

 আক্রান্ত গাছ মাটিসহ তুলে নষ্ট করা, গাছের পরিত্যক্ত অংশ ধ্বংস করা।

 আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় রোভরাল (প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম) বা ফলিকুর (প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি) স্প্রে করতে হবে।

বিটি বেগুনের জাত

বারি বিটি বেগুন-১ (উত্তরা), বারি বিটি বেগুন-২ (কাজলা), বারি বিটি বেগুন-৩ (নয়নতারা) ও বারি বিটি বেগুন-৪ নামের চারটি জাত কৃষক পর্যায়ে চাষের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। নিম্নে জাতসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হলো:

বারি বিটি বেগুন-১

এটি ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী জাত এবং এ জাতটি অন্য জাতের তুলনায়

আগাম ফলন দেয়। গাছ ছড়ানো ও ঝোপালো প্রকৃতির। ফল লম্বাটে ও ১৮-২০ সেমি লম্বা

হয়। গাছ প্রতি ফলের সংখাা ৫০-৫৫টি। প্রতি ফলের ওজন ৮০-৯০ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি ফলন

৫০-৫৫ টন।

বারি বিটি বেগুন-২

এটি ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী জাত এবং এ জাতটি অন্যান্য জাতের তুলনায় আগাম ফলন দেয়। ফলের আকার মাঝারি লম্বাকৃতি এবং রং চকচকে কালচে বেগুনী। গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা৪০-৪৫টি। প্রতি ফলের ওজন ১০০-১২০ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি ফলন ৫০-৫৫ টন।

বারি বিটি বেগুন-৩

এটি ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী জাত এবং জাতটির গাছ খাড়া আকৃতির। এ জাতটির ফল গোলাকার এবং রং উজ্জ্বল কালচে বেগুনী। গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ২৫-৩০টি। প্রতি ফলের ওজন ১৬০-১৮০ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি ফলন ৪৫-৫০ টন।

বারি বিটি বেগুন-৪

এটি ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী জাত। ফল ডিম্বাকৃতি এবং রং হালকা সবুজ।

গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ২০-২৫টি। প্রতি ফলের ওজন ২২০-২৫০ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি ফলন

৫০-৫৫ টন।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: আমাদের দেশের সব রকমের মাটিতে বেগুন চাষ করা যায় এবং ভাল ফলনও দিয়ে থাকে। তবে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ মাটিই এর চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। বেগুনের জন্য ১৫০ থেকে ২০০ সে. তাপমাত্রা সবচেয়ে উপযোগী। উচ্চ তাপমাত্রায় বেগুনের ফুল ও ফল উৎপাদন বিঘ্নিত হয় এবং এসময়

অনিষ্টকারী পোকার আক্রমণ বেশি হয়।

চারা উৎপাদন পদ্ধতি: শীতকালীন চাষের জন্য শ্রাবণের মাঝামাঝি থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলায় বীজ বপন করা যায়। বেগুন চাষের জন্য চারা উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের দেশে চাষী ভাইয়েরা সাধারণত সরাসরি বীজতলায় বীজ বপন করেন। দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করেন না। এতে বীজের পরিমাণ বেশি লাগে উপরন্তু চারার স্বাস্থ্য ভাল হয় না। প্রথমে বীজতলায় ঘন করে বীজ ফেলতে হয়। বীজ গজানোর ১০-১২ দিন পর গজানো চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করতে হয়। এতে চারা সুস্থ ও সবল হয় এবং ফলন ভাল

হয়। বীজতলায় মাটি সমপরিমাণ বালি, কমপোস্ট ও মাটি মিশিয়ে ঝুর ঝুর করে তৈরি করতে হয়। প্রতি হেক্টরের জন্য ২০০-২৫৫ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ বপন: বীজতলায় সারি করে বা ছিটিয়ে বীজ বপন করা যায়, তবে সারিতে বপন করা উত্তম। সারিতে বপনের জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট দূরত্বে (৫ সেমি) কাঠি বা টাইন দিয়ে ক্ষুদ্র নালা তৈরি করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ছোট বীজের বেলায় বীজের দ্বিগুণ পরিমাণ শুকনো ও পরিষ্কার বালু বা মিহি মাটি বীজের সাথে ভালভাবে মিশিয়ে মাটিতে বীজ বপন করতে হয়। শুকনো মাটিতে বীজ বপন করে সেচ দেয়া উচিত নয়, এতে মাটিতে চটা

বেঁধে চারা গজাতে ও বাতাস চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। যেসমস্ত বীজের আবরণ শক্ত, সহজে পানি প্রবেশ করে না, সেগুলোকে সাধারণত বোনার পূর্বে ভিজিয়ে নেয়া হয়।

বীজতলায় আচ্ছাদন: আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে বীজতলার উপরে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হবে যেন বৃষ্টির পানি ও অতিরিক্ত সূর্যতাপ থেকে বীজতলাকে রক্ষা করা যায়। আচ্ছাদন বিভিন্নভাবে করা যায়। তবে কম খরচে বাঁশের ফালি করে বীজতলায়

প্রস্থ বরাবর ৫০ সেমি পর পর পুঁতে নৌকার ‘ছৈ’ এর আকারে বৃষ্টির সময় পলিথিন দিয়ে এবং প্রখর রোদে চাটাই দিয়ে রক্ষা করা যায়।

চারার যত্ন: চারা গজানোর পর থেকে ১০-১২ দিন পর্যন্ত হালকা ছায়া দ্বারা অতিরিক্ত সূর্যতাপ থেকে চারা রক্ষা করা প্রয়োজন। পানি সেচ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচর্যা তবে বীজতলার মাটি দীর্ঘসময় বেশি ভেজা থাকলে অঙ্কুরিত চারা রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। চারার শিকড় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলে রোদ কোন ক্ষতি করতে পারে না, তখন এটি বরং উপকারী। চরা গজানোর ১০-১২ দিন পর বীজতলায় প্রয়োজন মতো দূরত্ব ও পরিমাণ মত চারা রেখে অতিরিক্ত

চারাগুলি যত্ন সহকারে উঠিয়ে দ্বিতীয় বীজতলায় সারি করে রোপণ করলে মূল্যবান বীজের সাশ্রয় হবে।

দ্বিতীয় বীজলায় চারা স্থানান্তরকরণ:

জমিতে চারা লাগানোর পূর্বে মূল বীজতলা থেকে তুলে দ্বিতীয় বীজতলায়

সবজি চারা রোপণের পদ্ধতি অনেক দেশেই চালু আছে। এ পদ্ধতিকে দ্বিতীয় সবজির চারা স্থানান্তরকরণ পদ্ধতি বলে। দেখা গেছে, ১০-১২ দিনের চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তরিত করা হলে কপি গোত্রের সবজি ও টমেটো চারার শিকড় বিস্তৃত ও শক্ত হয়, চারা অধিক সবল ও তেজী হয়। চারা উঠানোর আগে বীজতলায় পানি দিয়ে এরপর সূচালো কাঠি দিয়ে শিকড়সহ চারা উঠাতে হয়। উঠানো চারা সাথে সাথে দ্বিতীয় বীজতলায় লাগাতে হয়। বাঁশের সূচালো কাঠি বা

কাঠের তৈরি সূচালো ফ্রেম দ্বারা সরু গর্ত করে চারা গাছ লাগানো হয়। লাগানোর পর হালকা পানি দিতে হবে এবং বৃষ্টির পানি ও রোদ থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন ও চাটাই দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।

বীজতলায় চারার রোগ দমন: বীজতলায় বপনকৃত বীজ গজানোর পূর্বে বীজ এবং পরে কচি চারা রোগাক্রান্ত হতে পারে। অঙ্কুরোদগমরত বীজ আক্রান্ত হলে তা থেকে আদৌ চারা গজায় না। গজানোর পর রোগের আক্রমণ হলে চারার কাণ্ড মাটি সংলগ্ন স্থানে পচে গিয়ে নেতিয়ে পড়ে। একটু বড় হওয়ার পর আক্রান্ত হলে চারা সাধারণত মরে না, কিন্তু এদের শিকড় দুর্বল হয়ে যায়। চারা এভাবে নষ্ট হওয়াকে বলে ড্যাম্পিং-অফ। বিভিন্ন ছত্রাক এর জন্য দায়ী।

ড্যাম্পিং অফ রোগ বাংলাদেশে চারা উৎপাদনের এক বড় সমস্যা। বীজতলায় মাটি সব সময় ভেজা থাকলে এবং মাটিতে বাতাস চলাচলের ব্যাঘাত হলে এ রোগ বেশি হয়। এ জন্য বীজতলায় মাটি সুনিষ্কাশিত রাখা রোগ দমনের প্রধান উপায়। প্রতিষেধক হিসেবে মাটিতে কপার অক্সিক্লোরাইড বা ডায়থেন এম-৪৫ বা রিডোমিল গোল্ড এক থেকে সারিতে বীজতলায় বীজ বপন

দুই গ্রাম প্রতিলিটার পানিতে মিশিয়ে বীজতলার মাটি ভালকরে ভিজিয়ে কয়েকদিন পর বীজ বপন করতে হবে। প্রোভেক্স ২.৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজে মিশিয়ে বীজ বপন করবেন।

চারার কষ্ট সহিষ্ণুতা বর্ধন: রোপণের পর মাঠের প্রতিকূল পরিবেশ যেমন- ঠাণ্ডা আবহাওয়া বা উচ্চ তাপমাত্রা, পানির স্বল্পতা, শুষ্ক বাতাস এবং রোপণের ধকল ও রোপণকালীন সময়ে চারার সৃষ্ট ক্ষত ইত্যাদি যাতে সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারে সেজন্য বীজতলায় থাকাকালীন চারাকে কষ্ট সহিষ্ণু করে তোলা হয়। যে কোন উপায়ে চারার বৃদ্ধি সাময়িকভাবে কমিয়ে যেমন- বীজতলায় ক্রমান্বয়ে পানি সেচের পরিমাণ কমিয়ে বা দুই সেচের মাঝে সময়ের ব্যবধান বাড়িয়ে চারাকে কষ্ট সহিষ্ণু করে তোলা যায়। কষ্ট সহিষ্ণুতা বর্ধনকালে চারায় শ্বেতসার (কার্বোহাইড্রেট) জমা হয়

এবং রোপণের পর এই শ্বেতসার দ্রুত নূতন শিকড় উৎপাদনে সহায়তা করে। ফলে সহজেই চারা রোপণজনিত আঘাত সয়ে উঠতে পারে।

চারা উৎপাদনের বিকল্প পদ্ধতি: প্রতিকূল আবহাওয়ায় বীজতলায় চারা উৎপাদনের জন্য

বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে সবজির চারা কাঠের বা প্লাস্টিকের ট্রে, পলিথিনের ব্যাগে, মাটির টবে,

গামলায়, থালায়, কলার খোলে উৎপাদন করা যায়।

বিটি বেগুন চাষকৃত জমির নকশা: বিটি বেগুন চাষ অন্য সাধারণ বেগুন চাষের ন্যায়। তবে বিটি বেগুন চাষের জমি চার পার্শ্বে ১-২ সারি সাধারণ বেগুনের চারা উদ্বাস্ত ফসল হিসেবে রোপণ করতে হয়। নিম্নে প্রায় ১ বিঘা জমিতে বিটি বেগুন চাষের নমুনা নকশা দেয়া হলো

একটি কার্যকর সবজি বা ফসলের বেড তৈরির জন্য উপরে উল্লিখিত পরিমাপগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিচে এগুলোকে একটি অনুচ্ছেদে সাজিয়ে দেওয়া হলো:

ফসলের বেড তৈরির ক্ষেত্রে সঠিক মাপ অত্যন্ত জরুরি, যা ভালো ফলন এবং সহজ পরিচর্যা নিশ্চিত করে। বেডের **প্রস্থ হবে ৭০ সেন্টিমিটার**, যা পরিচর্যার জন্য আদর্শ। বেডের **দৈর্ঘ্য নির্ভর করবে জমির মোট দৈর্ঘ্যের ওপর**, তবে এটি এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে কাজ করতে সুবিধা হয়। দুটি বেডের মধ্যে **দূরত্ব হবে ১০০ সেনিমিটার থেকে ৮০ সেন্টিমিটার**, যা নালার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা দেবে। এই নালার **প্রস্থ হবে ৩০ সেন্টিমিটার** এবং **গভীরতা হবে ২০ সেন্টিমিটার**, যা সেচ ও জল নিষ্কাশনের জন্য সহায়ক।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ: বেগুন এমন একটি ফসল সার প্রয়োগ ব্যতীত যার সন্তোষজনক উৎপাদন চিন্তা করা যায় না। মাটি থেকে ইহা প্রচুর পরিমাণ খাদ্যোপাদান শোষণ করে। বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে খাদ্যের অভাব হলে গাছ দ্রুত বাড়ে না এবং পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যের স্বল্পতা ফলনের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই বেগুন চাষের জন্য হেক্টরপ্রতি নিম্নোক্ত পরিমাণ সার ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়

ফসলের ভালো ফলনের জন্য সারের সঠিক পরিমাণ ও সময়মতো প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি হেক্টরে **১০,০০০ কেজি গোবর/কম্পোস্ট** সারের মধ্যে **৫,০০০ কেজি শেষ চাষের সময়** এবং বাকি **৫,০০০ কেজি গর্তে প্রয়োগ করতে হবে**।ইউরিয়া সারটি একাধিক ধাপে ব্যবহার করতে হয়। এটি গর্তে, চারা লাগানোর ১৫ দিন পর, ফুল ধরা আরম্ভ হলে, ফল ধরা আরম্ভ হলে এবং ফল আহরণের সময়, প্রতিটি ধাপে **৬০ কেজি করে** দিতে হবে।টিএসপি সারের মোট পরিমাণ **২৫০ কেজি**, যার মধ্যে **১২৫ কেজি শেষ চাষের সময়** এবং বাকি **১২৫ কেজি গর্তে প্রয়োগ করতে হবে**।এমওপি সারের মোট পরিমাণ **২০০ কেজি**, যার মধ্যে **৫০ কেজি গর্তে**, **৪৫ কেজি চারা লাগানোর ১৫ দিন পর**, **৫২.৫ কেজি ফুল ধরা আরম্ভ হলে** এবং **৫২.৫ কেজি ফল ধরা আরম্ভ হলে** প্রয়োগ করতে হবে।এছাড়াও, **১০০ কেজি জিপসাম** এবং **১০ কেজি বোরিক অ্যাসিড (বোরন)** উভয়ই শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ প্রয়োগ করতে হবে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

 শেষ চাষের সময় অর্ধেক গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি এবং সবটুকু জিপসাম ও বোরিক এসিড সার জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

 বাকি অর্ধেক গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি এবং ৩৫-৪২.৫ কেজি এমপি সার চারা লাগানার ৭দিন পূর্বে গর্তে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

 সম্পূর্ণ ইউরিয়া (৫টি কিস্তিতে) ও বাকি এমপি সার (প্রথম ৩টি কিস্তিতে) যথাক্রমে চারা লাগানো ১৫ দিন পর, ফুল ধরা আরম্ভ হলে, ফল ধরা আরম্ভ হলে, ফল আহরণের সময় ২ বার সমভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপণ: ৩০-৩৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করা উত্তম। এ সময় প্রতিটি চারার ৫-৬টি পাতা হয়ে থাকে। অনিবার্য কারণে বেগুনের চারা ২ মাস বয়স পর্যন্ত রোপণ করা চলে। রোপণের দূরত্ব নির্ভর করে জাত ও মাটির ঊর্বরতার ওপর। সাধারণত ৭০ সেমি প্রশস্ত বেডে এক সারিতে চারা রোপণ করা হয়। দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি প্রশস্ত নালা থাকে। সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৭০-৮০ সেমি রাখতে হয়।

সেচ ব্যবস্থা : বেডের দু’পাশের নালা দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া সুবিধাজনক। নালায় সেচের পানি বেশিক্ষণ ধরে রাখা যাবে না, গাছের গোড়া পর্যন্ত মাটি ভিজে গেলে নালার পানি ছেড়ে দিতে হবে। খরিফ মৌসুমে জমিতে পানি যাতে না জমে সেজন্য পানি নিষ্কাশনের জন্য জমির চারপাশে নালা রাখতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: চারা লাগানোর ৫০-৬০ দিন পরই বেগুন তোলার সময় হয়। ৭-১০ দিন পরপর গাছ থেকে ধারাল ছুরির সাহায্যে বেগুন কাটা ভাল।

ফলন: ৩০-৭০ টন/হেক্টর।

পোকামাকড় : বিটি বেগুন ডগা ও ফল ছিদ্রকার পোকা প্রতিরোধী।

পোকা মাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা

পাতার হপার পোকা

ক্ষতির লক্ষণ: আক্রান্ত বেগুনের পাতা কিনারা বরাবর উপরের দিকে বেঁকে যায়। পাতার কিনারে হলুদাভ হয়ে যায় অথবা গুছে যাওয়ার মত মনে হয়। পাতার বৃদ্ধি ব্যাহত হয় বলে পাতা ছোট থেকে যায় এবং মোজাইক ধরনের হলুদ রং পরিলক্ষিত হয়। আক্রান্ত গাছে ফল ধরার সংখ্যা মারাত্মকভাবে কমে যেতে পারে। পাতার হপার পোকা প্রকৃত পক্ষে সারা বছরই বংশ বৃদ্ধি করে থাকে তবে শুষ্ক মৌসুমে এদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই পোকা পাতার নিচের দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম পাড়ে। প্রাপ্ত বয়স হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্ষুদ্র নিম্ফসমূহ পাতার নিচ দিক থেকে রস চুষে খায়। এদর জীবনকাল ৫-৭ সপ্তাহ এবং একই মৌসুমে একাধিক প্রজন্ম হয়ে থাকে।

দমন ব্যবস্থাপনা

 প্রতিরোধী জাত যেমন, বারি বেগুন-৬ বা বিএল ১১৪ চাষ করা।

 নিমতেল ৫ মিলি + ৫ গ্রাম ট্রিকস্ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নিচের দিকে ¯স্প্রে করা।

 এককেজি আধা ভাঙ্গা নিমবীজ ২০ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি পাতার নিচের দিকে ¯স্প্রে করা।

 পাঁচ গ্রাম পরিমাণ গুঁড়া সাবান প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নিচের দিকে স্প্রেকরা।

 আক্রমণের হার অত্যন্ত বেশি হলে ম্যালথিয়ন ৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক (প্রতিলিটার পানিতে ২ মিলি পরিমাণ) স্প্রেকরা অথবা এডমায়ার ১০০ এমএল (প্রতিলিটার পানিতে ০.২৫ মিলি পরিমাণ) মিশিয়ে ¯স্প্রেকরা।

ইপিল্যাকনা বিটল

ক্ষতির লক্ষণ: এই পোকা পাতার শিরাগুলোর মাঝের অংশ খেয়ে ফেলে। মধ্য শিরা বাদে পাতার সমস্ত অংশ খেয়ে ঝাঝরা করে ফেলতে পারে এবং ফলের উপরি ভাগের কিছু অংশ খেয়ে ফেলতে পারে অথবা ছোট ছিদ্র করতে পারে। প্রাপ্ত বয়স্ক ও কীড়া প্রায়শই একই সাথে দেখা যায়। প্রাপ্ত বয়স্ক পোকা সাধারণ লেডি বিটল এর মত দেখা যায় কিন্তু লেডি বিটল পোকা গাছ বা গাছের পোকা খায় না। ইপিল্যাকনা বিটল ডিম্বাকার এবং পিঠে কাল ফোটাযুক্ত বাদামী রঙের। কীড়ার রং ফ্যাকাশে হলুদ এবং পিঠের উপরিভাগে ও পাশে শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট ছোট ছোট কাঁটা দ্বারা আবৃত

থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক ¯ত্রী ইপিল্যাকনা বিটল বেশির ভাগ সময়ে পাতার নিচের দিকে সিগার আকৃতির হলুদ রঙের ডিম পারে। ডিম ফুটে কাটাযুক্ত হলুদ কীড়া বের হয়ে পাতার নিচের অংশ খাওয়া শুরু করে। ইপিল্যাকনা বিটলের কীড়া ৪টি ধাপ অতিক্রম করে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, পূর্ণাঙ্গ কীড়া ৬ মিমি লম্বা হয়ে থাকে। কালচে রঙের পিউপাসমূহ পাতা অথবা কাণ্ডে থাকতে দেখা যায়। ইপিল্যাকনা বিটলের জীবনচক্র ১৫-২০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং একই মৌসুমে কয়েক প্রজন্ম হয়ে থাকে।

দমন ব্যবস্থাপনা

 পোকাসহ আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পোকা মেরে ফেলা।

 নিমতেল ৫ মিলি + ৫ গ্রাম ট্রিকস প্রতিলিটার পানিতে মিশিয়ে রেখে উক্ত পানি ¯স্প্রেকরা।

 এক কেজি আধা ভাঙ্গা নিমবীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি ¯স্প্রে করা।

 আক্রমণের হার অত্যন্ত বেশি হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক (প্রতিলিটার পানিতে ২ মিলি পরিমাণ) স্প্রেকরা।

লাল মাকড়

ক্ষতির লক্ষণ: লাল মাকড় আক্রান্ত বেগুনের পাতায় হলুদাভ ছোপ ছোপ দাগের সৃষ্টি হয়। যখন এই ধরনের আক্রমণ পাতার নিচের দিকে মাঝখানে বেশি হয তখন প্রায় সব ক্ষেত্রেই পাতা কুঁকড়ে যেতে দেখা যায়। ব্যাপক আক্রমণের ফলে সম্পূর্ণ পাতা হলুদ ও বাদামী রং ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত পাতা ঝরে পড়ে। লাল মাকড় পাতার নিচের পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম পাড়ে যা খালি চোখে দেখা যায় না। এই ডিম থেকে কমলা রঙের বাচ্চা বের হয়ে পাতার নিচের পৃষ্ঠদেশে খেতে থাকে। এক সপ্তাহের মধ্যেই বাচ্চাগুলো গাঢ় কমলা বা লাল রঙের পূর্ণ মাকড়ে পরিণত হয় যা দেখতে ক্ষুদ্র মাকড়সার মত। এদের পাতার নিচের পৃষ্ঠদেশে চলাফেরা করতে দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

 নিমতেল ৫ মিলি + ৫ গ্রাম ট্রিকস্ প্রতিলিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নিচের দিকে ¯স্প্রেকরা।

 এক কেজি আধা ভাঙ্গা নিমবীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি পাতার নিচের দিকে ¯স্প্রে করা।

 আক্রমণ তীব্র হলে প্রতিলিটার পানির সাথে মাকড়নাশক (যেমন- ওমাইট ৫৭ তরল ১ মিলিলিটার হারে) পাতা ভিজিয়ে স্প্রেকরে মাকড়ের আক্রমণ প্রতিহিত করা সম্ভব। মাকড়নাশক পাওয়া না গেলে সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (কুমুলাক্স ইত্যাদি) স্প্রেকরে মাকড়ের আক্রমণ কমানো সম্ভব। লক্ষ্য রাখতে হবে, মাকড়ের সাথে অন্য পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রথমে মাকড়নাশক ব্যবহার করে অতঃপর কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

কাণ্ড ও ফল পচা রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

 ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়। সুস্থ ও রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করা।

 সেচ বা বৃষ্টির পর গাছের গোড়ার মাটি আলগা করা।

 প্রতিকেজি বীজে ২ গ্রাম ভিটাভেক্স ২০০ দিয়ে শোধন করা; ৫০০ সে. তাপমাত্রার গরম পানিতে ১৫ মিনিট রেখে বীজ শোধন করা।

 রোগ কাণ্ডে দেখা দিলে গাছের গোড়াসহ মাটি প্রতিলিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ অটোস্টিন/নোইন গুলিয়ে ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। বীজ বেগুনে রোগ দেখামাত্র ছত্রাকনাশক ¯স্প্রে করা।

 রোগ হয় এরূপ জমিতে কমপক্ষে ৩ বছর শস্য পর্যায় অনুসরণ করা।

 ফসল সংগ্রহের পর মুড়ি গাছ না রেখে সমস্ত গাছ, ডালপালা, পাতা ইত্যাদি একত্র করে পুড়িয়ে ফেলা।

ঢলেপড়া রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

 আক্রান্ত গাছ দেখলেই প্রাথমিকভাবে তা তুলে ধ্বংস করা।

 রোগ প্রতিরোধী যেমন- বারি বেগুন-৮, বারি বেগুন-১০ প্রভৃতি জাতের চাষ করা।

 বন বেগুন যথা টরভাম বা সিসিম্ব্রিফলিয়ামের সাথে জোড় কলম করা।

 রোগ প্রতিরোধী বারি বেগুন-৮ জাতকেও রুট স্টক হিসেবে ব্যবহার করে জোড় কলম করা যায়।

গুচ্ছপাতা রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

 আক্রান্ত গাছ দেখলেই প্রাথমিকভাবে তা তুলে ধবংস করা।

 ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করা।

 ক্ষেতে জ্যাসিড পোকার উপস্থিতি দেখা দিলে কীটনাশক প্রয়োগ করে তা দমন করা।

মুলা

মুলা রবি মৌসুমের একটি প্রধান সবজি। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ টন মুলা উৎপাদিত হয়। দেশে সকল শ্রেণির লোকের নিকট মুলা একটি সমাদৃত সবজি। সালাদ, তরকারি ও ভাজি হিসেবে এর বহুল প্রচলন রয়েছে। মুলার পাতা শাক হিসেবেও খাওয়া যায়। এতে প্রচুর

ভিটামিন ‘এ’ রয়েছে।

মুলার জাত

বারি মুলা-১ (তাসাকীসান মুলা)

১৯৮৬ সালে ‘বারি মুলা-১’ জাতটি অনুমোদন করা হয়। মুলা দেখতে ধবধবে সাদা ও বেলুনাকৃতির হয়। পাতায় শুং থাকে না বলে শাক হিসেবে ব্যবহারের জন্য খুবই উপযোগী। বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিন পর থেকেই সংগ্রহের উপযোগী হয়। প্রতি মুলার ওজন প্রায় ৯০০-১১০০ গ্রাম। মুলা খেতে সুস¦াদু ও প্রায় ঝাঁঝবিহীন। দেশীয় আবহাওয়ায় এ জাত প্রচুর পরিমাণ বীজ উৎপাদন করতে সক্ষম। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি মুলার ফলন ৭০-৮০ টন এবং বীজের ফলন ১.০-১.৫ টন হয়।

বারি মুলা-২ (পিংকী)

‘বারি মুলা-২’ নামে একটি লালচে রঙের মুলা জাত ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। এ জাতের মুলা নলাকৃতির । এ জাতের মুলার সাধারণত কোন শাখা শিকড় হয় না এবং ভিতরে সহজে ফাঁপা হয় না। বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিন পর সংগ্রহের উপযোগী হয় এবং প্রায় ৭৫ দিন পর্যন্ত তা খাওয়ার উপযোগী থাকে। প্রতি মুলার ওজন ৮০০-৯৮৮ গ্রাম। মুলা খেতে একটু ঝাঁঝালো।

স্থানীয় আবহাওয়ায় বীজ উৎপাদন করা যায়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৫৫-৬০ টন এবং ৯০০-১১০০ কেজি বীজ পাওয়া যায়।

বারি মুলা-৩ (দ্রুতি)

‘বারি মুলা-৩’ জাতটি ১৯৯৮ সালে অনুমোদন করা হয়। এ জাতের মুলার রং সাদা এবং

আকৃতি অনেকটা নলাকার। এ জাতের মুলা ৪০-৪৫ দিনের মধ্যেই খাবার উপযুক্ত হয়।

এদেশের আবহাওয়ায় দ্রুতি জাতের মুলার বীজ উৎপাদন করা যায়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ

করলে হেক্টরপ্রতি মুলার ফলন ৪০-৪৫ টন ও ১.২-১.৩ টন বীজ পাওয়া যায়।

বারি মুলা-৪

মুলা নলাকৃতি ধবধবে সাদা বর্ণের। পাতা খাঁজ

কাটা বিশিষ্ট। প্রতিটি মুলার গড় ওজন ৭০০-৮০০ গ্রাম। জাতটি দেশিয় আবহাওয়ায় ১.২-১.৫

টন/হেক্টর বীজ উৎপন্ন করে। বাংলাদেশের সর্বত্র শীতমৌসুমে এই জাতটি চাষ করা যায়। আশ্বিন-কার্তিক মাসে বীজ বপন করা হয়। জীবনকাল ৬০-৭০ দিন (বীজ বপনের পর) এবং হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৬৫-৭০ টন।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি মুলা চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল। অধিক পরিমাণ জৈব সার ও প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার ব্যবহার করে অধিকাংশ উঁচু জমির মাটিতে এর চাষ করা যায়।

বীজের হার ও বীজ বপন: আশ্বিন থেকে কার্তিক মাস মুলার বীজ বপন করা যায়। হেক্টরপ্রতি ২.৫-৩.০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। সাধারণত মুলার বীজ ছিটিয়ে বপন করা হয়। কিন্তু বীজ

সারিতে বপন করা ভাল। এতে বীজের পরিমাণ কম লাগে এবং পরবর্তী পরিচর্যা করা সহজ হয়।

সার প্রয়োগ: মুলার জমিতে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতি হেক্টর জমিতে **ইউরিয়া ৩০০-৩৫০ কেজি**, **টিএসপি ২৫০-৩০০ কেজি**, **এমপি ২১৫-২৩৫ কেজি**, এবং **গোবর বা কম্পোস্ট ৮-১০ টন** ব্যবহার করা যেতে পারে। এই সারগুলো ফসলের পুষ্টি চাহিদা পূরণে সহায়তা করে, যার ফলে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয় এবং ফলন বাড়ে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর বা কম্পোস্ট সারের এক তৃতীয়ংশ সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া ও এমপি সার সমান অংশে যথাক্রমে বীজ বপনের তৃতীয় ও পঞ্চম সপ্তাহে ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: বীজ বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে ৩০ সেমি দূরত্বে একটি ভাল গাছ রেখে বাকি গাছ উঠিয়ে ফেলতে হবে। মাটিতে রস কম থাকলে বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যেই একটি সেচ দিতে হয়। সাধারণত ২ সপ্তাহ পর পর ২-৩ বার সেচ দিলে মুলার ফলন ভাল হয়। গাছের বৃদ্ধির জন্য জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এজন্য নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা: শীতকালীন সবজিসমূহের মধ্যে মুলা বাংলাদেশে একটি অন্যতম সবজি। দেশে মুলা উৎপাদনের জন্য বিদেশি বীজের উপর নির্ভর করতে হয়। বাংলাদেশে আবাদকৃত বিদেশি মুলার জাত দ্বিবর্ষজীবী এবং স্থানীয় আবহাওয়ায় মাঠ পর্যায়ে এদের বীজ উৎপাদন হয় না। স্থানীয় আবহাওয়ায় বীজ উৎপাদনে সক্ষম ‘বারি মুলা- ১,২,৩,৪ নামে ৪ টি এক বর্ষজীবী মুলার জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

মুলার মূল ও পাতা কর্তন পদ্ধতি, বীজ উৎপাদন: মুলার বয়স ৪০-৪৫ দিন হলে জমি থেকে সমস্ত মুলা উঠিয়ে জাতের বিশুদ্ধতা, আকৃতি ইত্যাদি বিবেচনা করে বাছাই করতে হবে। বাছাইকৃত মুলার মূলের এক চতুর্থাংশ ও পাতার দুই তৃতীয়াংশ কেটে ফেলতে হবে। মূলের কাটা অংশ ডায়থেন এম-৪৫ (২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে) এর দ্রবণে ডুবিয়ে নিতে হবে। পরে প্রস্তুত করা বেডে সারি পদ্ধতিতে (৬০ X ৪৫ সেমি) কর্তন কৃত মুলা গর্তে স্থাপন করে পাতার

নিচ পর্যন্ত মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এ পদ্ধতিতে পূণরায় রোপণকৃত গাছ থেকে অধিক পরিমাণে বীজ পাওয়া যায়। বীজ-ফসলের জমিতে সর্বদা রস থাকতে হবে। গাছে ফুল আসার পর হেক্টরপ্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া ও ২০০ কেজি এমপি সার বেডে ছিটিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রতিকূল আবহাওয়ায় বীজ-ফসল যাতে মাটিতে পড়ে না যায় সেজন্য ঠেকনা দিতে হবে। মুলার বীজ ফসলে জাব পোকা দেখা দেওয়া মাত্র ম্যালাথিয়ন ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বপনের পর ৪-৫ মাসের মধ্যেই বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত হয়।

বোরন সার প্রয়োগ: সুষম সারসহ মুলার জমিতে প্রতি হেক্টরে ১০-১৫ কেজি বরিক এসিড/বোরাক্স প্রয়োগ করে মুলার বীজের ফলন বড়ানো যায়।

শিম

শিম সবজি হিসেবে বাংলাদেশের সর্বত্র বাণিজ্যিকভাবে ও বসতবাড়িতে চাষাবাদ হচ্ছে।

শিমে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ‘সি’, ও ক্যারোটিন বিদ্যমান। শিমে প্রোটিনের

সমৃদ্ধতা এবং আঁশ জাতীয় উপাদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিম শীতকালীন সবজি হলেও বর্তমানে

গ্রীষ্মকালে এর চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে।

শিমের জাত

বারি শিম -১

‘বারি শিম-১’ নামে উফশী শিম জাতটি বাছাইয়ের মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে

অনুমোদন করা হয়। শিমের বর্ণ সবুজ। প্রতিটি শিম ২.০-২.৫ সেমি প্রশ্বস্ত।

প্রতিটি শিমের ওজন ১০-১১ গ্রাম এবং শিমপ্রতি ৪-৫টি বীজ হয়। প্রতি গাছে ৪৫০-৫০০টি শিম ধরে। শিম পাকার পূর্ব পর্যন্ত নরম থাকে । জাত মাঝারী আগাম। এ জাতটির জীবনকাল ২০০-২২০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ২০-২২ টন ফলন পাওয়া যায়। জাতটি ভাইরাসজনিত রোগ প্রতিরোধী। বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে এ জাতটি চাষ করা যায়।

বারি শিম-২

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত এ জাতটি ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়।

প্রতিটি শিম ১.৫-৩.০ সেমি প্রশ্বস্থ। প্রতি শিমের ওজন ৭-৮ গ্রাম। প্রতিটি শিমে ৪-৫টি বীজ হয়। প্রতিটি গাছে ৩৮০-৪০০টি শিম ধরে। পাকার পূর্ব পর্যন্ত ফল নরম থাকে।এক মৌসুমে ১৫ থেকে ১৬ বার শিম সংগ্রহ করা যায়। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ জাতটি চাষাবাদ করা যায়। জীবনকাল ১৯০-২১০ দিন। ফলন ১২-১৪ টন/হেক্টর।

বারি শিম-৩ (গ্রীষ্মকালীন)

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ‘বারি শিম-৩’ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। তাপ অসংবেদনশীল ও দিবস নিরপেক্ষ জাত। বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়। ফুল সাদা রঙের এবং শিম সবুজ বর্ণের। প্রতিটি শিমের ওজন ৬-৭ গ্রাম। প্রতিটি শিমে ৪-৫টি বীজ হয়। গাছপ্রতি ৪৫০-৫০০টি শিম ধরে এবং পাকার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নরম থাকে। ১২-১৪ বার শিম সংগ্রহ করা যায়। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ জাতটি চাষ করা যায়। গ্রীষ্মকালে চাষ করতে হলে মার্চ মাসে এবং শীতকালের জন্য জুন মাসে বীজ বপন/চারা রোপণ করতে হয়। জীবনকাল ১৫০-১৮০ দিন। ফলন ৯-১০ টন/হেক্টর (গ্রীষ্মকালে) এবং ১৫-১৮ টন/হেক্টর (শীতকালে)।

বারি শিম-৪

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ‘বারি শিম-৪’ জাতটি মুক্তায়িত হয়েছে। এটি উচ্চ ফলনশীল শিমের জাত এবং দীর্ঘদিন ব্যাপী সংগ্রহ করা যায়। শিম কাস্তে আকৃতির। ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ সহনশীল জাত। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ জাতটি চাষ করা যায়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে এ জাতের বীজ বপন করা যায়। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৬-১৮ টন।

বারি শিম-৫

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ‘বারি শিম-৫’ জাতটি মুক্তায়িত হয়েছে। এ জাতের গাছ খাটো প্রকৃতির তাই মাচা ছাড়াই ছোট খুঁটি দিয়ে চাষ করা যায়। গাছের উচ্চতা ৩৫-৪৫ সেমি। প্রতি গাছে ৫০-৬০টি শিম পাওয়া যায় এবং শিম সবুজ, নরম মাংসল, কম আঁশযুক্ত হয়ে থাকে। লাগানোর ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে ফুল আসতে শুরু করে এবং ৭৫-৮৫ দিন পর্যন্ত শিম সংগ্রহ করা যায়। সারা দেশে সবজি চাষের এলাকায় এ জাতটি চাষ করা যায়। বীজের হার প্রতি হেক্টরে ১২-১৫ কেজি। আশ্বিন মাসে বপন করে কার্তিক মাসে রোপণ করলে ফলন ভাল হয়। রোপণ দূরত্ব ৬০ X ৫০ সেমি। জীবনকাল ৭৫-৮৫ দিন। ফলন ১২-১৪ টন/হেক্টর।

বারি শিম-৬

বাছাই প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত এ জাতের শিম নলডক ধরনের। পডগুলো খুব ১.৭৫-২.২৫ সেমি প্রশ্বস্থ। পডগুলো কাস্তে আকৃতির, নরম মাংসল ও আঁশ বিহীন। গাছপ্রতি পডের সংখ্যা ২৫০-৩০০টি। বীজ সামান্য চ্যাপ্টা, কুচকানো কালচে বাদামী রঙের। জাতটি বাংলাদেশের সকল

এলাকায় চাষাবাদ উপযোগী। জীবনকাল ২২০-২৫০ দিন। ফলন ১৭-২০ টন/হেক্টর।

বারি শিম-৭ (গ্রীষ্মকালীন)

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ‘বারি শিম-৭’ জাতটি অবমুক্ত করা হয়। ‘বারি শিম-৭’ একটি উচ্চ ফলনশীল গ্রীষ্মকালীন জাত, উচ্চ তাপমাত্রায় ফুল ও ফল ধারণে সক্ষম এবং সারা দেশে চাষ উপযোগী। প্রতি গাছে ৪০০-৫০০টি শিম পাওয়া যায় এবং শিম ৮-১০ সেমি লম্বা, সবুজ, নরম মাংসল, কম আঁশযুক্ত হয়ে থাকে। কিনারাসহ পুরো ফলের ত্বক সবুজ বর্ণ বিশিষ্ট। ফলন ১২-১৩ টন/হেক্টর।

বারি শিম-৮

বারি শিম-৮ একটি উচ্চ ফলনশীল শীতকালীন জাত, সারা দেশে চাষ উপযোগী। এটি অন্যান্য চাষযোগ্য শিমের তুলনায় ২০-৩০ দিন আগে সংগ্রহ করা যায়। শিম নরম, মাংসল ও আঁশ কম। শিম সবুজ লম্বা, কিছুটা বাকানো। বীজ আকারে বড়। হেক্টরপ্রতি গড় উৎপাদন ২০-২২ টন/হেক্টর। পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ কম হয়।

বারি শিম-৯ (খাইস্যা)

জাতটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর বড় ও পুষ্ট বীজ; বীজ গোলাকার এবং রং সাদাটে; ১০০ টি বীজের গড় ওজন ১৩০ গ্রাম এবং ১০০ কেজি শিম থেকে প্রায় ৪৯ কেজি ভক্ষণযোগ্য বীজ (খাইস্যা) পওয়া যায়। গাছের কাণ্ড সরু, নলাকার ও সবুজ বর্ণের এবং প্রধান কাণ্ড কিছুটা দীর্ঘ হওয়ার পরই শাখা-

প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কাণ্ডে কোন আকর্ষী নেই তাই বাউনী পেচিয়ে উপরের দিকে উঠে। ফুল সাদা এবং পাপড়ি মেলার ২-৩ দিন পর ফুল ঝরে পড়ে। সাধারণত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ফুল ধরা শুরু করে তিন মাসাধিক কাল গাছে ফুল থাকে। শিমের শুঁটি চ্যাপ্টা,

দৈর্ঘ্যে ৮.৮-৮.৯ সে.মি. ও প্রস্থে ২.০৩-২.২৩ সে.মি. এবং হালকা সবুজ বর্ণের। শিম সংগ্রহকাল সময় মূলত জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত। প্রতি গাছে গড়ে ৬৮৫-৭১৫ টি পর্যন্ত শিম পাওয়া যায়।

বারি শিম-১০ (খাইস্যা)

জাতটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর বড় ও পুষ্ট বীজ; বীজ কিছুটা লম্বাটে এবং রং গোলাপী; ১০০ টি বীজের গড় ওজন ১২৯ গ্রাম এবং ১০০ কেজি শিম থেকে প্রায় ৪৪ কেজি ভক্ষণযোগ্য বীজ

(খাইস্যা) পওয়া যায়। গাছের কাণ্ড, শাখা- প্রশাখা, পাতা ও ফুলের বৈশিষ্ট্য বারি শিম-৯ এর অনুরূপ । সাধারণত নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফুল ধরা শুরু করে আড়াই মাসাধিক কাল গাছে

ফুল থাকে। শিমের শুঁটি লম্বা এবং মাথার দিকে সুচালো, দৈর্ঘ্যে ১১.২-১১.৪ সে.মি. ও প্রস্থে ১.৯৫-২.২২ সে.মি. এবং গাঢ় সবুজ বর্ণের। বীজের আকর্ষণীয় রঙের কারণে এর ভোক্তা

চাহিদা বেশি এবং বাজার মূল্যও অধিক যা অন্যান্য দেশি শিমের জাত থেকে একে পৃথক করেছে। শিম সংগ্রহকাল মূলত জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত। প্রতিটি গাছে গড়ে

৫৪৯-৫৭৫ টি পর্যন্ত শিম পাওয়া যায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও জলবায়ু: সব ধরনের মাটিতেই শিম জন্মে। তবে সুনিষ্কাশিত দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি ভাল ফলনের জন্য উপযুক্ত। ফসলের অঙ্গজ বৃদ্ধি ও প্রজনন পর্যায়ের জন্য তাপমাত্রা ও দিবস দৈর্ঘ্য যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এ সবজির অঙ্গজ বৃদ্ধির জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র্র্র্র জলবায়ু এবং দীর্ঘ দিবস প্রয়োজন। আবার প্রজনন ধাপের জন্য নিম্ন তাপমাত্রাসহ হ্রস¦ দিবস প্রয়োজন। লক্ষ্য করা যায় যে, শিম যখনই বপন করা হউক না কেন শীতের প্রভাব না পড়লে পুষ্পায়ন ঘটে না।

তবে গ্রীষ্মকালীন জাতগুলো তাপ ও দিবস নিরপেক্ষ হওয়ায় বছরের যে কোন সময় বপন/রোপণ করলে পুষ্পায়ন ঘটে।

জীবনকাল : আগাম জাত : ১৩০- ১৬০ দিন (বীজ সংগ্রহ পর্যন্ত)।

নাবী জাত: ১৫০- ২০০ দিন (বীজ সংগ্রহ পর্যন্ত)।

বীজ বপনের সময় : আষাঢ় মাসের মাঝামাঝী থেকে বীজ বপন করা যেতে পারে। তবে আগাম ফসলের জন্য জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝী থেকে আষাঢ়ের মাঝামাঝী (জুন মাস) বীজ বপন করা উত্তম। গ্রীষ্মকালীন জাতগুলো বছরের যে কোন সময় বপন করা যায়। বপনের সময় দূরত্ব এবং বপন পদ্ধতির উপর বীজের হার নির্ভর করে।

বীজের হার: প্রতি হেক্টরে ৭.৫ কেজি, একরে ৩.০ কেজি এবং শতকে ৩০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন।

জমি তৈরি: জমি ৪-৫টি চাষ দিয়ে ঢেলা ভেঙ্গে খুব পরিপাটি করে তৈরি করতে হয়। এর পর সমতল জমিতে সঠিক দূরত্বে উঁচু মাদা তৈরি করে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা যায়। তবে সেচ ও পানি নিকাশের সুবিধা এবং পরবর্তী পরিচর্যার সুবিধার জন্য মিড়ি তৈরি করে মিড়িতে বীজ বপন করা সবচেয়ে ভাল। মিড়ি ১৫ থেকে ২৫ সেমি উঁচু এবং ২.৫ মিটার প্রশ্বস্ত হবে। জমির প্রকৃতি এবং কাজের সুবিধা বিবেচনা করে মিড়ির দৈর্ঘ্য ঠিক করতে হয়। সেচ ও পানি

নিকাশের সুবিধার জন্য পাশাপাশি দুটি মিড়ির মাঝখানে ৫০ সেমি প্রশ্বস্ত ১৫ থেকে ২৫ সেমি গভীর পিলি রাখতে হয়। ২.৫ মিটার প্রশ্বস্ত মিড়ির উভয় পার্শ্বে ৫০ সেমি করে বাদ দিয়ে ১.৫ মিটার দূরত্বে মিড়ির লম্বালম্বি দু’টি লাইন টেনে নিতে হবে। মিড়ির ২ লাইন বা সারিতে ১.৫ মিটার দূরে দূরে ৩০দ্ধ৩০দ্ধ৩০ সেমি সাইজের মাদাতে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করে তৈরি করে ফেলতে হবে। এতে সারি থেকে সারির দূরত্ব ১.৫ মিটার এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের

দূরত্ব হল ১.৫ মিটার। তাছাড়া ২টি মিড়ির মধ্যে ৫০ সেমি প্রশস্ত পিলি থাকায় পাশাপাশি দু’টি মিড়ির নিকটতম সারি দুটির দূরত্ব হল ১.৫ মিটার। তবে আজকাল ১ মিটার প্রস্থ বেডে ও একক সারি পদ্ধতিতে ১.০-১.৫ মিটার দূরত্বে বীজ বপন/চারা রোপণ করা যায়। উভয় পদ্ধতিতে একক আয়তনের জমিতে সমসংখ্যক গাছ সংকুলান হয়। তবে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে গাছের পরিচর্যা ও ফসল উত্তোলন কার্যক্রম পরিচালনা সুবিধাজনক।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: শিম ডাল জাতীয় শস্য। এতে সারের পরিমাণ বিশেষ করে নাইট্রোজেন সারের পরিমাণ কম লাগে।

গোবর ১০ টন ,ইউরিয়া ২৫ কেজি - ১২.৫ ১২.৫, টিএসপি ৯০ কেজি ,এমওপি ৬০ কেজি - ৩০ ৩০, জিপসাম ৬০ কেজি (সালফার সার) ,বোরিক এসিড ৫ কেজি|

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর সার এবং জিপসাম ও বরিক এসিড সবটুকু ছিটিয়ে জমিতে প্রয়োগ করে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বীজ বপন বা চারা রোপণের ৪-৫ দিন আগেই ইউরিয়া ও এমপি (পটাশ) সারের অর্ধেক এবং টিএসপি সারের সবটুকু একত্রে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাদার মাটির সাথে (১০ সেমি গভীর পর্যন্ত) কোদালের দ্বারা হালকাভাবে কুপিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বপন/রোপণের ৩০ দিন পর বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার মাদায় উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সারের নাম মোট শেষ চাষের বপন/চারা গর্তে উপরি পরিমাণ সময় প্রয়োগ রোপণের প্রয়োগ (বপনের/সময় গর্তে প্রয়োগ রোপণের ৩০ দিন পর)

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা:

 বপনকৃত বীজ থেকে চারা বের হওয়ার পর ৮-১০ দিনের মধ্যেই প্রতিটি মাদায় একটি সুস্থ সবল চারা রেখে বাকিগুলি উঠিয়ে ফেলতে হবে।

 দেশি শিমের ক্ষেত সর্বদা আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

 গাছ ২৫-৩০ সেমি উঁচু হলেই বাউনী দিতে হবে এবং মাচা তৈরি করে শিম গাছকে তুলে দিতে হবে। তবে চারা গাছ মাচায় উঠা পর্যন্ত গোড়ার দিকে যেন না পেচাতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গোড়া পেচাতে না দিলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন প্রায় ১০-১৫% বেশি হয়।

 মাটির রস যাচাই করে ১০-১৫ দিন পর পর সেচ দিতে হবে।

 পুরাতন পাতা ও ফুল বিহীন ডগা/শাখা কেটে ফেলতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন: জাতভেদে বীজ বপনের ৯৫-১৪৫ দিন পর শিমের শুঁটি (পড) গাছ থেকে তুলে বাজারজাত করা যেতে পারে। ফুল ফোঁটার ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে শিম তোলার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। ৫-৭ দিন অন্তর অন্তর গাছ থেকে শিম তুললে মোট ১৩-১৪ বার গুণগত মানসম্পন্ন শুঁটি (পড) সংগ্রহ করা যায় এবং এতে হেক্টরপ্রতি প্রায় ১৫-২০ টন শিম পাওয়া যায়।

ঝাড় শিম

ঝাড় শিম একটি পুষ্টিকর সবজি। এর কচি শুঁটি, অপক্ক ও পরিপক্ক বীজ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শীতকারে বাংলাদেশে সর্বত্র চাষ করা যায়। পুষ্টিকর সবজি হিসেবে ঝড় শিমের চাহিদা রয়েছে দেশব্যাপী।

ঝাড় শিমের জাত

বারি ঝাড় শিম-১ (ফরাসী শিম)

‘বারি ঝাড় শিম-১’ জাতটি ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। গাছ খাটো ও

ঝোপালো। শিম সবুজ, কিছুট বাঁকা। এটি চওড়ায় ১.০-১.৫ সেমি হয়। প্রতিটি শিমের ওজন ৫-৬ গ্রাম। ফুল এবং বীজের রং সাদা। থোকায় থোকায় সবুজ শিম ধরে। সারিতে ঘন করে গাছ লাগিয়ে চাষ করা যায়। শীত মৌসুমে বাংলাদেশের সর্বত্র এ জাতটি চাষাবাদ করা যায়।

বীজ বপন থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত ৪০-৪৫ দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ১৩-১৪ টন পর্যন্ত হয়। এ জাতের গাছ খাটো তাই মাচা বা বাউনি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এ জাতটি উচ্চ ফলনশীল, কিছুটা ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী এবং দ্রুত বর্ধনশীল।

বারি ঝাড় শিম-২

‘বারি ঝাড় শিম-২’ জাতটি ২০০২ সালে অনুমোদন করা হয়। গাছ খাটো ও মাঝারী ধরনের ঝোপালো। শিম হালকা সবুজ, নলাকৃতির। এটি ল¤¦ায় ১০-১২ সেমি এবং চওড়ায় ০.৭-০.৮ সেমি হয়। থোকায় থোকায় সবুজ শিম ধরে। প্রতি থোকায় ২-৫টি শিম ধরে ।

সারিতে ঘন করে গাছ লাগিয়ে চাষ করা যায়। শীত মৌসুমে বাংলাদেশের সর্বত্র এ জাতটি চাষাবাদ করা যায়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ১২-১৫ টন পর্যন্ত হয়। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

বারি ঝাড় শিম-৩ (খাইস্যা)

‘বারি ঝাড়শিম-৩’ (খাইস্যা) জাতটি ২০১০ সালে অনুমোদন করা হয়। এটির পড খাওয়া হয় না, বীজ খাইস্যা হিসেবে খাওয়া হয়। গাছ খাটো ও ঝোপালো। জাতটির ফুল সাদা রঙের। থোকায় থোকায় শিম ধরে। শিম সবুজ, সোজা, ১৪-১৬ সেমি ল¤¦া এবং ১.০-১.৩ সেমি চওড়া হয়। প্রতি গাছে ৮-১০টি পড বা শিম হয়। প্রতি পডে ৫-৬টি বীজ থাকে। খাওয়ার উপযোগী

১০০ বীজের ওজন ১১০-১১৫ গ্রাম হয়।বীজগুলো কালচে খয়েরী রঙের। পরিপক্ক বীজ খাইস্যা হিসেবে খাওয়া হয়। চট্টগ্রাম এবং সিলেট অঞ্চলে খাইস্যা খুবই জনপ্রিয়। আস্তে আস্তে সারা দেশেই খাইস্যা জনপ্রিয় হচ্ছে। বীজ বপন থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত ৭৫-৮০ দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি খাইস্যা বীজের ফলন ৪.৫-৫ টন হয়।

বাংলাদেশে শীতকালে দেশের প্রায় সর্বত্র এ জাত চাষযোগ্য। এ জাতের গাছ খাটো তাই মাচা বা বাউনি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

উৎপাদন প্রযুক্তি

আবহাওয়া ও মাটি: বেলে-দোআঁশ বা দোআঁশ মাটিতে (pH ৫.৪-৭.৫) ও অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাপমাত্রায় (১০-২৫০ সে.) এ শিম ভাল জন্মে। বাংলাদেশে শীতকালে এ ফসলটি ভালভাবে উৎপাদন করা যায়। এটি দিবস নিরপেক্ষ হলেও খরা ও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত সহ্য করতে পারে না।

বপন পদ্ধতি: সরাসরি জমিতে লাইন করে বীজ বুনতে হয়। ২৫-৩০ সেমি দূরত্বের সারিতে ১০-১৫ সেমি দূরে দূরে বীজ লাগাতে হয়।

বপনের সময়: আমাদের দেশে নভে¤¦র মাস ‘ঝাড় শিম-৩’ (খাইস্যা) বীজ বপনের জন্য সবচেয়ে উত্তম সময়। তবে সুনিষ্কাশিত জমি হলে অক্টোবর মাসে রোপণ করতে পারলে আগাম খাইস্যা শিমের দাম ভাল পাওয়া যায়।

সারের পরিমাণ

ইউরিয়া ২০০-২৫০ কেজি, টিএসপি ২০০-২৫০ কেজি, এমওপি ১৫০-১৮০ কেজি ,গোবর ৫ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: জমি তৈরির সময় সমুদয় গোবর, টিএসপি, এমপি ও অর্ধেক ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হয়। বাকি ইউরিয়া ১৫ দিন ও ৩০ দিন পর ২ বারে উপরি প্রয়োগ করা হয়।

বীজের হার: ১২০-১২৫ কেজি/হেক্টর।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: ফসলে ঠিকমত সার প্রয়োগ, আগাছা দমন, পানি সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগবালাই: বড় ধরনের কোন পোকা এবং রোগের প্রাদুর্ভাব নেই। জমিতে চারা অবস্থায় ফুটরট রোগ কোন কোন সময় দেখা যায়। বীজ বপনের পূর্বে শোধন করে এবং চারা গাছে স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়। ভিটাভেক্স ২০০ প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম হারে মিশিয়ে বপন করলে রোগের প্রাদুর্ভাব কমে যায়। আবার চারা অবস্থায় রোগ দেখা দিলে অটোস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে চারার গোড়ার মাটি ভিজিয়ে প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যায়।

বারি ঝাড় শিম-৩

মটরশুঁটি

মটরশুঁটি একটি পুষ্টি সমৃদ্ধ ও সুস্বাদু শীতকালীন সবজি। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার হেক্টর (মাঠ ও বাগান ছাড়া) জমিতে চাষাবাদ হয় এবং মোট প্রায় ১৬ হাজার টন শুঁটি উৎপাদিত হয়। বিশেষভাবে শহর অঞ্চলে এ সবজির জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মটরশুঁটির জাত

বারি মটরশুঁটি-১

‘বারি মটরশুঁটি-১’ নামে এ জাতটি বাছাইকরণ পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত হয়

এবং ১৯৯৬ সালে অনুমোদন লাভ করে। জাতটি উচ্চ ফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধী। ফুলের রং সাদা এবং শুঁটি সবুজ। প্রতি শুঁটিতে ৪-৭টি সবুজ বীজ থাকে। শুঁটি বেশ মিষ্টি। প্রতিগাছে ২০-২৫টি শুঁটি ধরে। পরিপক্ক শুকনা বীজ কুঁচকানো ও রং বাদামী।বপনের ৭০-৭৫ দিনের মধ্যে সবুজ শুঁটি সংগ্রহ করা যায়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ১০-১২ টন সবুজ শুঁটি উৎপন্ন হয়। জাতটি ডাউনি মিলডিউ ও পাউডারি মিলডিউ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

বারি মটরশুঁটি-২

এশীয় সবজি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের সহযোগিতায় প্রাপ্ত এ জাতটি বাছাইকরণ পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত হয় এবং ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। শুঁটি হালকা সবুজ। আকৃতি কিছুটা চ্যাপ্টা। শুঁটির আকার ৮ X ২ সেমি। এ জাতের মটরশুঁটি বেশ নরম। অপরিপক্ক বীজসহ সবুজ শুঁটি

শিমের মত ভক্ষণযোগ্য। শুঁটি সালাদ হিসেবে বা সিদ্ধ করে খাওয়া যায়। পরিপক্ক শুকনা বীজ গোলাকার ও সবুজ। এ জাত দ্রুত বর্ধনশীল। বীজ রোপণের ৬৫-৭০ দিনের মধ্যে সবুজ শুঁটি সংগ্রহ করা যায়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে প্রতি হেক্টরে ১২-১৪ টন ফলন পাওয়া যায়। জাতটি পাউডারি মিলডিউ ও ডাউনি মিলডিউ রোগ প্রাতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

বারি মটরশুঁটি-৩

‘বারি মটরশুটি-৩’ জাতটি বাছাইকরণ পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত হয় এবং ১৯৯৯ সালে অনুমোদন করা হয়। এটি একটি আগাম জাত যা বপনের ৫৫-৬০ দিনের মধ্যেই সংগ্রহ করা যায়। পডস্তলো হালকা সবুজ রঙের এবং পডে ৫-৭টি বীজ থাকে। বীজ ক্রিসপি এবং মিষ্টি স্বাদ যুক্ত। পরিপক্ক বীজ গোলাকার, হালকা সবুজ। ফলন ৮-৯ টন/হেক্টর।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: মটর শীতল ও আংশিক আর্দ্র জলবায়ুর উপযোগী ফসল। ১০০-১৮০ সে. তাপমাত্রায় এটি সবচেয়ে ভাল জন্মে, ২০০ সে. এর উপরে তাপমাত্রা যতো বৃদ্ধি পায় ফলনও ততো কমে আসে এবং অপক্ক বীজের গুন ততো খারাপ হয়। ৩০০ সে. এর উপরে মটরের চাষ প্রায় অসম্ভব। মটরের জন্য দোঁ-আশ মাটি সবচেয়ে ভাল। এঁটেল মাটিতে প্রায়শই রোগে চারা গাছ নষ্ট হতে দেখা যায়। মাটি অবশ্যই সুনিষ্কাশিত হতে হবে। অম্লক্ষারত্ব ৫.৫ থেকে ৬.৫ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

চাষের মৌসুম: বাংলাদেশের মটর চাষের উপযোগী জলবায়ুর স্থায়িত্ব মাত্র চার মাস, নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি। নভেম্বর মাসই বীজ বোনার উৎকৃষ্ট সময়। অক্টোবরেও বীজ বোনা যেতে পারে, তবে প্রায়শই নাবি বৃষ্টিপাতের কারণে এ সময় জমি তৈরি সম্ভব হয় না। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে তাপমাত্র দ্রুত বৃদ্ধি পায়, এ সময় ফল না দিয়েই ফুল ঝরে পড়ে এবং গাছ পাউডারী মিলডিউ রোগে আক্রান্ত হয়। তাই ফলন পেতে হলে মৌসুমের শুরুতেই আগাম জাত লাগানো উচিত।

জমি তৈরি ও বীজ বপন: মটরের গাছ চারা অবস্থায় খুব দূর্বল থাকে, এ জন্য ভাল ফলন পেতে হলে মিহি করে জমি প্রস্তুত করা উচিত। কোন কোন সময় মটরের বপনকৃত বীজ পাখি এবং ছত্রাক দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য বীজ কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করে লাগালে ফসলের নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়। মটরে বীজ বপনের দূরত্ব গাছের উচ্চতা অনুযায়ী নির্ণয় করা হয়। খাটো জাত ৩০ সেমি. এবং উঁচু জাত ৫০ সেমি. ব্যবধানে সারি করে লাগানো যেতে পারে। সারিতে খাটো এনং উঁচু জাত যথাক্রমে ১৫ ও ২০ সে.মি.দূরত্বে বীজ বুনতে হবে। বপনের পদ্ধতি ও দূরত্ব অনুযায়ী প্রতি হেক্টরে ৭০-৮০ কেজি বীজ লাগে।

সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)

ফসলের ফলন নিশ্চিত করতে এবং মাটির উর্বরতা বজায় রাখতে সঠিক পরিমাণে সার প্রয়োগ জরুরি। প্রতি হেক্টরে মোট **১০-১২ টন গোবর** সার ব্যবহার করতে হয়, যা সম্পূর্ণটাই **শেষ চাষের সময়** জমিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।রাসায়নিক সারের ক্ষেত্রে, **১০০ কেজি ইউরিয়া** সারের মধ্যে অর্ধেক অর্থাৎ **৫০ কেজি শেষ চাষের সময়** প্রয়োগ করতে হবে। বাকি **৫০ কেজি** দুই ধাপে উপরি প্রয়োগ করতে হবে: **২৫ কেজি বীজ বপনের ২০ দিন পর** এবং আরো **২৫ কেজি বীজ বপনের ৪০ দিন পর**।

এছাড়াও, **১৫০ কেজি টিএসপি** সার সম্পূর্ণটাই **শেষ চাষের সময়** প্রয়োগ করতে হবে। এবং **১০০ কেজি এমওপি** সারের মধ্যে অর্ধেক অর্থাৎ **৫০ কেজি শেষ চাষের সময়** দিতে হবে। বাকি **৫০ কেজি** দুই ধাপে উপরি প্রয়োগ করতে হবে: **২৫ কেজি বীজ বপনের ২০ দিন পর** এবং বাকি **২৫ কেজি বীজ বপনের ৪০ দিন পর**।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর ও টিএসপি এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেক এমওপি সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালো ভাবে মিাশয়ে দিতে হবে।বাকিগোবর ও টিএসপি সার চারা লাগানোর ৭ দিন পূর্বে গর্তে মাটির সাথে ভালোভাবে মিাশয়ে দিতে হবে।

বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ও এমওপি সার ২ কিস্তিতে বীজ বপনের ২০ ও ৪০ দিন পর সমভাবে গাছের গোড়ায় মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

পরিচর্যা: মটরের গাছ শুয়ে পড়লে ফলন কমে যায় এবং মাটির সংস্পর্শে পাতা ও শুঁটি সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। ভাল ফলন পেতে হলে গাছ যাতে সোজা অবস্থায় থাকে সেজন্য বাউনী দেয়া প্রয়োজন। সারি বরাবর কিছু দূরে দূরে খুঁটি পুঁতে সুতলী দিয়ে সেগুলো যুক্ত করে কম খরচে বাউনী তৈরী করা যায়।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন: বীজ বোনার ৩৫-৪০ দিন পর আগাম জাতে এবং ৫০-৬০ দিন পর নাবি জাতের গাছে ফুল আসে। ফুল ফোটার ২০-২৫ দিন পর অপক্ক বীজের জন্য শুঁটি সংগ্রহ করা যায়। পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু শক্ত হয়নি এমন পর্যায়ে সংগৃহীত বীজের গুন সবচেয়ে ভাল হয়। জাত ও ফসলের যত্ন অনুযায়ী প্রতি হেক্টওে ৩-৫ টন শুঁটি পাওয়া যায়। শুঁটির ওজনের ৩৫-৪০% বীজ।সার মোট সারের পরিমান শেষ চাষের সময় প্রয়োগ বীজ বপনের ২০ দিন পর

উপরি প্রয়োগ বীজ বপনের ৪০ দিন পর

রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

১। পাউডারী মিলডিউ

রোগের লক্ষন: ছত্রাক দ্বারা এই রোগ সৃষ্টি হয়। এ রোগের আক্রমণ হলে পাতায় সাদা

পাউডারের মত ছোট ছোট দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে এ দাগ কান্ড, ফুল ও ফলে বিস্তার লাভ করে। রোগের আক্রমণ বেশি হলে সমস্ত গাছ আক্রান্ত হয় ও মারা যায়।

রোগের প্রতিকার

শুটি সংগ্রহ করার পর ফসলের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

রোগ প্রতিরোধী/সহনশীল জাত ব্যবহার করতে হবে। অত্যধিক সেচ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।সালফার জাতীয় বালাইনাশক থিওভিট ৮০ ডব্লিউ পি অথবা কমুলাস ডি এফ জাতীয় ঔষুধ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ৫-৭ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করলে এ রোগের আক্রমণ প্রতিহত করা যায়।

২। মরিচা রোগ

রোগের লক্ষন: ছত্রাকের আক্রমণে মরিচা রোগ হয়ে থাকে। পাতার নিচের দিকে, কান্ডে

ও ফলের উপর মরিচা রঙের ছোট ছোট দাগ দেখা যায় এবং ফল পাকার পূর্বেই গাছ শুকিয়ে খড়ের মত রং ধারণ করে। উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা, কুয়াশাচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া এবং রাতের তাপমাত্রা ২০-২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে এ রোগ সহজেই বিস্তার লাভ করে।

রোগের প্রতিকার

দেরীতে বীজ বপন না করে মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বরের মধ্যে বীজ বপন করতে হবে।

লিগুমিনোসি বহির্ভূত ফসলের সাথে মটরশুটির ২-৩ বছর শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে। রোগ প্রতিরোধী/সহনশীল জাত ব্যবহার করতে হবে।অধিক নাইট্রোজেন সার দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

আক্রান্ত ফসলে প্রোপিকোনাজোল (টিল্ট ২৫০ইসি) অথবা টেবুকোনাজোল (ফলিকুর ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ টি স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়। স্প্রে করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন স্প্রে দ্রবন ভালোভাবে পাতার নীচের দিকে পড়ে।

৩। ডাউনি মিল্ডিউ

রোগের লক্ষন: ছত্রাকের আক্রমণে ডাউনি মিল্ডিউ রোগ হয়ে থাকে। ফুল আসার আগে পাতার

নীচের পৃষ্ঠে ঝুলন্ত কিছুর বৃদ্ধি দেখা যায়। রোগের প্রকোপ বাড়ার সাথে সাথে পাতার আক্রান্ত স্থান বাদামী ধুসর বর্ণের হয়, শুকিয়ে যায় এবং পুর্ণতাপ্রাপ্তি হওয়ার আগেই ঝরে পড়ে। যদি তরুণ বর্ধিষ্ণু কাণ্ড আক্রান্ত হয় তবে এটি কুচকিয়ে যায় এবং এর বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে য্ায় এবং পরবর্তীতে গাছ খর্বাকৃতির হয়। এ রোগ দ্বারা শুটি তখনই আক্রান্ত হয় যখন শুটিগুলো কচি

এবং চ্যাপ্টা থাকে। ক্ষত স্থান ফ্যাকাশে সবুজ বর্ণের ও কমরবশী ডিম্বাকৃতির হয়, শুটির পার্শ্ব বরাবর স্পষ্ট দাগ দেখা যায় অথবা শুটিতে এ্যাবড়োথেবড়ো লম্বাটে লেশন তৈরি হয়। লেশনগুলো ক্রমান্বয়ে উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের হয়।

রোগের প্রতিকার

ফসলের মাঠ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। শুটি সংগ্রহ করার পর ফসলের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।লিগুমিনোসি বহিভূত ফসলের সাথে মটরশুটির ২-৩ বছর শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধী/সহনশীল জাত ব্যবহার করতে হবে।অত্যধিক সেচ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।গ্রীষ্মে জমি গভীরভাবে চাষ দিতে হবে এবং আগাছাসমূহ দূর করতে হবে। ।

রিডোমিল গোল্ড অথবা হেক্সাকোনাজোল (ফলিকুর ২৫০ ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি মিশিয়ে ৭-১০-১৫ দিন পর পর ২-৩ টি স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

জাব পোকা দমন ব্যবস্থা:

প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত পাতা ও ডগার জাব পোকা হাত দিয়ে পিষে মেরে ফেলা যায়। কীটনাশক ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি অথবা ডাইমেথোয়েট (যেমন টাফগর) এর ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে.মিশিয়ে ¯ স্প্রে করতে হবে।

ফলছিদ্রকারী পোকা দমন ব্যবস্থা:

পোকা সহ আক্রান্ত ফল হাতে বাছাই করে মেরে ফেলতে হবে। এক কেজি আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি ¯ স্প্রে করতে হবে। আক্রমনের হার অত্যন্ত বেশী হলে সাইপারমেথ্রিন ৪০ ইসি জাতীয় কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ১ মি. লি.মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ৩-৪ বার ¯ স্প্রে করা।

ফুলকপির জাত

বারি ফুলকপি-১ (রূপা)

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় একটি প্রজাতি থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়

এবং ১৯৯৮ সালে অনুমোদন করা হয়। প্রতিটি ফুলকপির ওজন ৮৫০-১০০০ গ্রাম।

ফুলকপি চারদিকে পাতা দ্বারা আংশিক ঢাকা থাকে। এদেশের জলবায়ুতে ‘বারি

ফুলকপি-১’ জাতের বীজ উৎপাদন করা যায়। জীবন কাল ৯৫-১০৫ দিন। উন্নত

পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-২৮ টন হয়। বীজের ফলন হেক্টরপ্রতি

৪৫৮-৫৫০ কেজি। জাতটি বাংালাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের উপযোগী।

বারি ফুলকপি-২

বারি ফুলকপি-২ বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত গ্রীষ্মমন্ডলীয় মাঝারি আগাম

জাত। প্রতিটি ফুলকপির গড় ওজন ৭৫০-৮০০ গ্রাম। সংগ্রহের সময় কপি মজবুত ও সাদাটে ক্রীম রঙের হয়। বীজ বপন থেকে ৮৫ দিনের মধ্যে ফুলকপি খাওয়ার উপযুক্ত সময়। জীবনকাল: ৯৫-১০৫ দিন। এ জাতটি দেশের জলবায়ুতে সর্বত্র বীজ উৎপাদনে সক্ষম। জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র শীত মৌসুমে ( মাঝারি আগাম) চাষাবাদের উপযোগী। ফলন কার্ড ২৫ টন/ হেক্টর এবং বীজ (৪৫০ গ্রাম/ হেক্টর)।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: সেচ ও পানি নিকাশের সুবিধা আছে এমন জমি ফুলকপি চাষের জন্য উপযুক্ত। অবশ্য প্রয়োজনীয় পরিচর্যায় সব রকমের মাটিতেই ফুলকপির চাষ করা সম্ভব। আগাম ফসলের জন্য দোআঁশ মাটি নির্বাচন করা যেতে পারে। তবে ফুলকপির সফল চাষের জন্য মাটিতে যথেষ্ট জৈব সার থাকা দরকার এবং মাটির অম্লতা ৬.০ থেকে ৬.৫ হলে ভাল হয়। ফুলকপির বৃদ্ধির জন্য ঠাণ্ডা ও আর্দ্র জলবায়ু উত্তম। ফুলকপি চাষের জন্য সবচেয়ে অনুকূল মাসিক

গড় তাপমাত্রা ১৫-২২০ সে.।

বীজ বপনের সময় এবং বীজের পরিমাণ: আগাম জাতের ফুলকপির বীজ বপনের উপযুক্ত সময় আগস্ট মাস (মধ্য শ্রাবণ থেকে মধ্য ভাদ্র)। মাঝারি জাতের ফুলকপির বীজ বপন করতে হয় সেপ্টেম্বর মাসে (মধ্য আশ্বিন)। আর নাবি জাতের বীজ অক্টোবর মাস (মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য কার্তিক)। হেক্টরপ্রতি ফুলকপি চাষের জন্য বীজের প্রয়োজন হয় ২০০-২৫০ গ্রাম।

চারা উৎপাদন: ফুলকপি চাষের জন্য চারা উৎপাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে সাধারণত ফুলকপির বীজ সরাসরি বীজতলায় বপন করা হয়। চারাগুলি দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করা হয় না। এতে বীজের পরিমাণ বেশি লাগে। উপরন্তু চারার স্বাস্থ্য ভাল হয় না। অথচ ভাল ফসল পেতে হলে সুস্থ সবল চারা লাগাতে হয়। তাই প্রাথমিকভাবে বীজতলায় ঘন করে বীজ ফেলতে হয়। বীজ গজানোর ১০-১২ দিন পর গজানো চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করতে হয়। প্রতিটি বীজতলার আকার পাশে ১ মিটার এবং লম্বায় ৩ মিটার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এতে অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। এক হেক্টর জমির চারা উৎপাদন করতে ২০টি বীজতলার প্রয়োজন হয়। বীজতলার মাটি সমপরিমাণ বালি, মাটি ও কম্পোস্ট মিশিয়ে ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হয়। দ্বিতীয় বীজতলায় চারা স্থানান্তরের ৭/৮ দিন পূর্বে প্রতিটি বীজতলায় ১৫০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম এমপি মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। পরবর্তীতে চারা বৃদ্ধির হার কম হলে প্রতিটি বীজতলায় ৮০-১০০ গ্রাম ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হবে।

জমি তৈরি: সারা দিন রোদ পায় এমন জমি ফুলকপি চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত। গভীর চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। এরপর দু’সারিতে চারা রোপণের জন্য ১ মি. চওড়া ১৫ থেকে ২০ সেমি উঁচু মিড়ি (বেড) তৈরি করতে হবে। সেচ ও পানি নিকাশের সুবিধার জন্য মিড়িতে চারা রোপণ করাই ভাল। মিড়ির দৈর্ঘ্য জমির আকৃতি এবং কাজের সুবিধা বিবেচনা করে যত ইচ্ছা করা যেতে পারে। পাশাপাশি দুই মিড়ির মাঝখানে ৩০ সেমি প্রশস্ত এবং ১৫-২০ সেমি গভীর পিলি (নালা) থাকবে। পিলির মাটি তুলেই মিড়ি তৈরি করা হয়। সেচ দেয়া এবং পানি নিকাশের জন্য পিলি অত্যন্ত জরুরি।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

ফুলকপির একরপ্রতি ফলন যথেষ্ট। তাই জমিতে সারের কমতি হলে গাছের বৃদ্ধি আশানুরুপ হয় না এবং পরবর্তীতে ফলন কমে যায়। তাই ফুলকপির জমিতে জৈব এবং রাসায়নিক উভয় প্রকারের সার প্রয়োগ করা উচিত। ফুলকপি চাষের জমি সাধারণত নিন্মোক্ত হারে সার প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়।

হেক্টরপ্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

ফসলের ভালো ফলন পেতে সারের সঠিক পরিমাণ ও সময়মতো প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি হেক্টরে মোট ১০ টন গোবর সারের মধ্যে অর্ধেক অর্থাৎ ৫ টন শেষ চাষের সময় এবং বাকি ৫ টন চারা রোপণের আগে গর্তে প্রয়োগ করতে হবে।

রাসায়নিক সারের ক্ষেত্রে, ১৫০ কেজি ইউরিয়া সম্পূর্ণটাই উপরি প্রয়োগ করতে হয়। এর মধ্যে প্রথম কিস্তিতে ৭৫ কেজি চারা রোপণের ১৫ দিন পর এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে ৭৫ কেজি রোপণের ৩৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

এছাড়াও, ১৫০ কেজি টিএসপি সারের অর্ধেক ৭৫ কেজি শেষ চাষের সময় এবং বাকি ৭৫ কেজি চারা রোপণের আগে গর্তে প্রয়োগ করতে হবে।

অন্যদিকে, ১২০ কেজি এমওপি সারের মধ্যে ৬০ কেজি প্রথম কিস্তিতে (১৫ দিন পর) এবং বাকি ৬০ কেজি দ্বিতীয় কিস্তিতে (৩৫ দিন পর) উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

অবশেষে, ১০০ কেজি জিপসাম এবং ১০ কেজি বোরিক অ্যাসিড উভয়ই সম্পূর্ণটাই শেষ **চাষের সময়** প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপণ: বীজ বপণের ৩০-৩৫ দিনের মধ্যেই চারা জমিতে রোপণের উপযুক্ত হয়। এসময় প্রতিটি চারায় ৫-৬টি প্রকৃত পাতা হয়ে থাকে। জমির উর্বরতা এবং গাছের বৃদ্ধির উপর রোপণের দূরত্ব নির্ভর করে। ফুলকপির চারা দু’সারি পদ্ধতিতে রোপণ করা হয়। সাধারণত এক মিটার প্রশস্ত মিড়িতে ৬০ সেমি দূরত্বে দু’সারিতে ৪৫ সেমি দূরে দূরে চারা রোপণ করা হয়।

রোপণের জন্য চারা একদিন পূর্বে নার্সারি বীজতলা ভালভাবে ভিজিয়ে নিতে হবে। এতে চারা উঠানো সহজ হয় এবং চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ঠাণ্ডার দিনে বা বিকালেই চারা উঠানো এবং রোপণ করা উচিত। কারণ রাতের বেলা চারা ধকল সামলিয়ে উঠতে পারে। রোপণের পরপরই গোড়ায় সেচ দিলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং চারা কম মারা যায়। তবে কিছু সংখ্যক

চারা নষ্ট হয়ে থাকে। রোপণের ৭ খেকে ১০ দিনের মধ্যেই অতিরিক্ত চারা রোপণ করে খালি জায়গাগুলি পূরণ করতে হবে।

পরবর্তী পরিচর্যা: রোপনের পর প্রথম ৪-৫ দিন পরপরই সেচ দিতে হবে। পরবর্তীতে ৮-১০ দিন অন্তর বা প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিলেই চলবে। সেচ পরবর্তী জমিতে ‘জো’ আসলে ফুলকপির স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য চটা ভেঙ্গে দিতে হবে এবং জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। সারের উপরি প্রয়োগ যথাসময়ে করতে হবে। উল্লেখ্য সারের উপরি প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে। পানি সেচ ও নিকাশের জন্য নালা সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে।

ফসল সংগ্রহ : রোপণের পর গাছে যখন ১২ থেকে ১৫টি পাতা হয় তখনই প্রপুস্প মঞ্জুরী দেখা যায়। নাবি জাতসমূহে বা যে সমস্ত জাত দি¦-বর্ষজীবী সে ক্ষেত্রে ২৫-৩০ পাতা হওয়ার পর পুস্প মঞ্জুরী দেখা যায়। এরপর পূর্ণ আকার ধারণ করতে আরও ১৫ দিন সময় লাগে। জাতভেদে রোপণের ৪০-৪৫ দিন পর পুস্পমঞ্জুরী দেখা যায় এবং ৮০-৯০ দিন পর সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। অবশ্য নাবি জাতে বিশেষ করে যেগুলি দ্বি-বর্ষজীবী সে গুলো আরও অনেক বেশি সময় নিয়ে থাকে। ফুলকপির প্রপুস্পমঞ্জুরী একটি নির্দিষ্ট আকার লাভ করার পর দৃঢ়, ঠাসা এবং

আকর্ষণীয় অবস্থায় সংগ্রহ করা ভাল। পাতা যাতে ফুলকপির পুস্পমঞ্জুরীকে আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারে সেজন্য পাতাসহ ফুলকপি আহরণ বা সংগ্রহ করতে হয়।

ফলন: উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে হেক্টরপ্রতি ২৫ থেকে ৩৫ টন ফুলকপি পাওয়া যায়।

ফুলকপির বীজ উৎপাদন: যে সব ফুলকপির জাত এদেশীয় আবহাওয়ায় উৎপাদন অনুকূল সেসব জাতের বীজ উৎপাদন করা সম্ভব। তবে ফুলকপি পরপরাগায়িত ফসল। এর বীজ উৎপাদনের জন্য অন্য জাত থেকে কমপক্ষে ১০০০ মিটার প্রাথকীকরণ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। সাধারণত নির্বাচিত সবচেয়ে ভাল ফুলকপিগুলি সংগ্রহ না করে মাঠেই রাখা যেতে

পারে। সেখানেই প্রপুষ্প মঞ্জুরীগুলি ফুলে পরিণত হবে এবং মার্চ/এপ্রিল মাসে অর্থাৎ চৈত্র মাসেই বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। এ পদ্ধতিতেই সবচেয়ে বেশি বীজ পাওয়া যায়। যেহেতু নির্বাচিত গাছগুলি ক্ষেতে দূরে দূরে থাকে এগুলি পরিচর্যা ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া জমিও পড়ে থাকে। এসব বিষয় বিবেচনা করে বীজের জন্য নির্বাচিত গাছগুলি

পুষ্পমঞ্জুরীসহ উঠিয়ে যথাযথ সার এবং যত্নসহকারে তৈরি একটি জায়গায় ৭৫ সেমি X ৭৫ সেমি দূরত্বে রোপণ করা যেতে পারে। স্থানান্তরের সময়ে প্রপুষ্পমঞ্জুরীর মধ্যবর্তী অংশ কেটে ফেলতে হয়। এতে বীজের মান উন্নত হয়। মৌমাছি

যাতে ভিড়তে পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং এসময় কোন কীটনাশক ছিঠানো ঠিক হবে না।

বাঁধাকপির জাত

বারি বাঁধাকপি-১ (প্রভাতী)

‘বারি বাঁধাকপি-১’ জাতটি বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয় এবং ১৯৮৫ সালে অনুমোদন করা হয়। জাতটি এদেশে ফুল ও বীজ উৎপাদনে সক্ষম। বীজ বপনের ১০০-১১০ দিন পরই বাঁধাকপি সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। প্রতিটি বাঁধাকপির ওজন ২.০-২.৫ কেজি। এটি একটি বিশুদ্ধ জাত বলে চাষী নিজেরাই বীজ উৎপাদন করতে পারে।

প্রভাতী জাত থেকে হেক্টরপ্রতি ৪০০-৫০০ কেজি বীজ উৎপাদন করা যায়। জীবন কাল কপি উৎপাদনে ১০০-১১০ দিন এবং বীজ উৎপাদনে প্রায় ১৮০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ৫০-৬০ টন ফলন পাওয়া যায়। দেশের উত্তরাঞ্চলে চাষ করে বীজের ভাল ফলন পাওয়া সম্ভব।

বারি বাঁধাকপি-২ (অগ্রদূত)

এশীয় অঞ্চলের একটি উষ্ণমণ্ডলীয় প্রজাতি থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯৮ সালে তা সারাদেশে চাষের জন্য অনুমোদন করা হয়।

বাঁধাকপি গোলাকার, উপর-নিচ চ্যাপ্টা। পাতার পৃষ্ঠদেশে পাতলা মোমের আবরণের মত বস্তু রয়েছে। প্রতিটি বাঁধাকপির ওজন ২.০-২.৫ কেজি। জাতটি বাংলাদেশের জলবায়ুতেই বীজ উৎপাদন করে। বীজ বপন থেকে কপি উৎপাদন পর্যন্ত ১০০-১১০ দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৫৫-৫৬ টন এবং বীজের ফলন ৫৫০-৬৫০ কেজি পাওয়া যায়। এ জাত বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের উপযোগী।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: প্রায় সব ধরনের মাটিতে বাঁধাকপি জন্মানো যায়। তবে দোআঁশ ও পলি দোআঁশ মাটি উত্তম। জমি তৈরি ও চারা রোপণ: গভীর চাষ দিয়ে মাটির ঢেলা ভেঙ্গে আগাছা পরিষ্কার করে ভালভাবে বাঁধাকপির জন্য জমি তৈরি করতে হয়।

চারা রোপণ: বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর চারা রোপণের উপযুক্ত হয়। উত্তমরূপে জমি তৈরি করার পর ১৫-২০ সেমি উঁচু ১ মিটার প্রশ্বস্ত বেড তৈরি করতে হয়। পাশাপাশি ২টি বেডের মাঝখানে ৩০ সেমি প্রশস্ত নালা রাখতে হবে। বেডের উপর ৬০ সেমি দূরত্বে ২টি সারি করে সারিতে ৪৫ সেমি দূরে দূরে চারা লাগাতে হয়।

বপনের সময়: ভাদ্র-আশ্বিন (মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-অক্টোবর) থেকে শুরু করে কার্তিক (মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বর) পর্যন্ত বারি বাঁধাকপির চারা রোপণ করা যেতে পারে। অগ্রহায়ণ মাসে (মধ্য-নভেম্বর থেকে মধ্য-ডিসেম্বর) রোপণ করলে মাথা তেমন বাঁধে না ও অকালে ফুল এসে যায়।

সারের পরিমাণ: বাঁধাকপির জমিতে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হয়।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি ও ১০০ কেজি এমপি সার জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সম্পূর্ণ ইউরিয়া ও বাকি এমপি সার ৩ কিস্তিতে চারা রোপণের ১০, ২৫ এবং মাথা বাঁধার সময় প্রয়োগ করতে হবে।

পানি সেচ: উচ্চ ফলনের জন্য বাঁধাকপিতে চারা রোপণের ২০-৩০ দিন পর পর ২-৩টি সেচ দিতে হবে।

চীনাকপির জাত

বারি চীনাকপি-১

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে ‘বারি চীনাকপি-১’ পাতাজাতীয় সবজিটি অনুমোদন করা হয়। এ জাত শীতকালে বাধাঁকপির মত শক্ত কপি উৎপাদন করে। গ্রীষ্মকালেও এ জাতটি শাক হিসেবে চাষাবাদ করা যায়। সালাদ হিসেবে এ সবজির যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে।

জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল। প্রতিটি কপির ওজন ১.০-১.৫ কেজি। এ জাতটি বাংলাদেশের

আবহাওয়ায় বীজ উৎপাদন করতে পারে। বপনের ৬০-৭০ দিনের মধ্যেই ফসল উঠানো যায়। তবে বীজ উৎপাদনের জন্য ১০৫-১২০ দিন সময় লাগে। রবি মৌসুমে প্রতিটি কপির ওজন ১.০-১.৫ কেজি। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন প্রতি হেক্টরে ৪০-৪৫ টন সবজি এবং প্রতি হেক্টরে ৫০০-৬০০ কেজি বীজ উৎপাদন করা সম্ভব।

বাংলাদেশে প্রায় সব এলাকায় শীতকালে এ সবজির চাষ করা যায়। গ্রীষ্মকালে উঁচু ও সুনিষ্কাশিত জমিতে বেড করে ‘বারি চীনাকপি-১’ এর চাষ করা যায়।

লালশাকের জাত

বারি লালশাক-১

লালশাকের এ জাতটি ‘বারি লালশাক-১’ নামে ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা

হয়। পাতা ও কাণ্ড উজ্জ¦ল লাল।‘বারি লালশাক-১’ এর পাতার বোঁটা ও কাণ্ড নরম। গাছ উচ্চতায় ২৫-৩৫ সেমি। প্রতিগাছে ১৫-২০টি পাতা থাকে। গাছের ওজন ১০-১৫ গ্রাম। ফুলের রং লাল, বীজ গোলাকার, বীজের উপরিভাগ কালো ও কিছুটা লাল দাগ মিশ্রিত। রান্নার পর শাকের রং গাঢ় লাল হয়। ‘বারি লালশাক-১’ বীজ বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে তোলা যায়। বীজ উৎপাদনের

জন্য ১১০-১৩০ দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ১২-১৪ টন হয়। ‘বারি লালশাক-১’ ভিটামিন ‘এ’, ‘বি’, ‘সি’ ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: প্রায় সব ধরনের মাটিতেই সার বছর ‘বারি লালশাক-১’ এর চাষ করা যায়। তবে শীত মৌসুমে লালশাকের ফলন বেশি হয়। গ্রীষ্ম মৌসুমে পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত জমিতে লালাশাক চাষ করা যায়। দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি লালশাকের জন্য উত্তম।

জমি তৈরি: জমি খুব ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করতে হবে। মাটি ও জমির প্রকার ভেদে ৪টি চাষ ও মই দিতে হয়।

বীজ বপন: লালশাক বীজ ছিটিয়ে ও সারিতে বপন করা যায়। তবে সারিতে বপন করা সুবিধাজনক। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০ সেমি দিতে হবে। একটি কাঠির সাহায্যে ১.৫-২.০ সেমি গভীর লাইন টেনে বীজ বুনে মাটি সমান করে দিতে হবে।

বপনের সময়: সারা বছরই এ জাতের লালশাক চাষ করা যায়।

বীজের হার: হেক্টরপ্রতি ২.০-২.৫ কেজি।

অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা: বীজ গজানোর ১ সপ্তাহ পর প্রত্যেক সারিতে প্রতি ৫ সেমি অন্তর গাছ রেখে অন্যান্য গাছ তুলে ফেলতে হবে। নিড়ানি দিয়ে জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। জমির উপরিভাগে মাটিতে চটা হলে নিড়ানি দেওয়ার সময় তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

বারি চীনাশাক

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত চীনাশাক জাতটি ১৯৮৪ সালে অনুমোদন করা হয়। এটি একটি দ্রুত বর্ধনশীল সবুজ পাতাজাতীয় সবজি। সরিষা গোত্রীয় এই সবজি জাতটি এদেশে সারা বৎসর উৎপাদন করা যায়। হালকা সবুজ পাতা অবস্থায় শাক হিসেবে খাওয়া যায়।

চীনাশাক ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় জাতটি পর্যাপ্ত পরিমাণ বীজ উৎপাদন করতে সক্ষম। বীজ লাগানোর ৪০-৪৫ দিনের মধ্যেই শাক হিসেবে উঠানো যায়। সবজি

হিসেবে গ্রীষ্মকালে এবং বীজ উৎপাদনের জন্য শীতকালে বীজ বপন করতে হয়। বীজ উৎপাদনের জন্য ৯০-১০৫ দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করে হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ টন সবুজ পাতা এবং ৭০০-৭৫০ কেজি বীজ পায়া যায়। স¦ল্পকালীন, উচ্চ ফলনশীল এবং সারা বছর উৎপাদনযোগ্য এ সবজির চাষ বেশ লাভজনক।

বারি বাটিশাক

বিদেশ থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাটিশাক নামে এ জাতটি ১৯৮৪ সালে অনুমোদন করা হয়। প্রতি গাছে ২০-২৫টি পাতা থাকে। পাতার দৈর্ঘ্য ২২-২৫ সেমি এবং প্রস্থ ১৮-২০ সেমি। পাতা ও পাতার বোঁটা নরম। পাতার রং গাঢ় সবুজ ও বোঁটার রং সাদা।

স¦ল্পকালীন, উচ্চ ফলনশীল এবং সারা বছর চাষোপযোগী। এ জাত স্থানীয় আবহাওয়ায় বীজ উৎপাদন করতে পারে। জীবনকাল শাকের জন্য ৪০-৫০ দিন এবং বীজের জন্য ১১০-২০ দিন।

উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ৪৫-৫৫ টন শাক এবং ৭০০-৮০০ কেজি বীজ পাওয়া যায়। দেশের প্রায় সর্বত্র সারা বছরই এ জাতের সবজি চাষ করা যায়।

বাটিশাক ও চীনাশাক উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: প্রায় সব ধরনের মাটিতেই বাটিশাক ও চীনাশাক চাষ করা যায়। তবে বেলে মাটি ও বেলে দোআাঁশ মাটিতে এ ফসল ভাল জন্মে।

জমি তৈরি: তিন থেকে চারবার উত্তমরূপে জমি চাষ করে ১ মিটার প্রশস্ত বেড তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। জমিতে সেচ দেওয়া ও অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বীজ বপনের সময়: সারা বছরই বাটিশাক ও চীনাশাক চাষ করা যায়। বীজ উৎপাদনের জন্য শীতকালে চাষ করতে হয়।

সারের পরিমাণ: বাটিশাক ও চীনাশাকের জমিতে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হয়।

ভালো ফলনের জন্য প্রতি হেক্টরে **২০০-২৫০ কেজি ইউরিয়া** সার প্রয়োজন। ইউরিয়া সারকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করে প্রয়োগ করা উচিত, কারণ এর দ্রুত কার্যকারিতা থাকে।

এর পাশাপাশি, মাটির পুষ্টি উপাদান নিশ্চিত করতে **১০০-১৫০ কেজি টিএসপি** এবং **১৫০-২০০ কেজি এমওপি** সার ব্যবহার করা যেতে পারে। এই সারগুলো ফসলের বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

রাসায়নিক সারের পাশাপাশি মাটির জৈব উপাদান বাড়াতে **১০-১২ টন গোবর** সার ব্যবহার করা খুবই উপকারী। এই গোবর সার প্রয়োগে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং পানি ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ে।

উৎপাদন পদ্ধতি: বীজতলায় চারা তৈরি করে অথবা সরাসরি জমিতে বীজ বপন করে চাষ করা যায়। সরাসরি বীজ বপনের ক্ষেত্রে একটু ঘন করে বীজ বপন করতে হবে। চারা কিছুটা বড় হলে খাওয়া যায়। সব শেষে ২০-২৫ সেমি দূরত্বে একটি করে চারা রেখে দেওয়া হয়। ৪০-৪৫ দিনের মধ্যেই গাছ সংগ্রহের সময় হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: সাফল্যজনকভাবে বাটিশাক ও চীনাশাকের চাষ করতে হলে পরিমিত সেচ জরুরি।

প্রয়োজনমত নিড়ানী দিয়ে আগাছামুক্ত রাখতে হবে।